POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ
رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَآ اَفْرِغْ
عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ○

এবং তুমি আমাদের উপর শুধু এই জন্য প্রতিশোধ লইতেছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছি, যখন ঐগুলি আমাদের নিকট আসিল। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে আত্ম-সমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।'

(আল আরাফ: ১২৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 39

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 29 সেপ্টেম্বর, 2022 2 রবিউল আওয়াল 444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

ক্রয়-বিক্রয়ের ইসলামী নীতি

২১৩৯) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- 'তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যেন নিজ ভাইয়ের ক্রয় করা পণ্যের উপর (বর্ধিতমূল্যে) ক্রয় না করে।

২১৪০) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত আছে যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- 'শহরের বাসিন্দা গ্রামের বাসিন্দার পক্ষ থেকে ক্রয় করবে। আর তোমরা ধোকা দেওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে দর হেঁকে মূল্য বাড়িয়ে তুলবে না। আর কেউ যেন নিজ ভাইয়ের ক্রয় করার পণ্যের উপর (বর্ধিত মূল্যে)ক্রয় না করে। আর নিজ ভাইয়ের নিকাহর প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয় আর কোনও মহিলা অপর মহিলার পাত্র থেকে অবশিষ্টাংশ নিজে ঢেলে নেওয়ার উদ্দেশ্যে যেন নিজ বোনের তালাক না চায়।

২১৪২) হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) বলেছেন, 'নাজাশ' অর্থাৎ ধোকা দিয়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটাতে নিষেধ করেছেন।

নোটঃ কোন ব্যক্তি সত্যি সত্যিই পণ্য ক্রয় করতে আগ্রহী নয়, অথচ অন্য ব্যক্তির পণ্যের মূল্য অপরের থেকে বেশি দিতে চেয়ে পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়াকে 'নাজাশ' বলা হয়।

(বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বুইয়ু)

জুমআর খুতবা, ২৬ শে আগস্ট ২০২২
ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান।
প্রশ্নোত্তর পর্ব

আঁ হযরত (সা.) কখনও তাঁর বয়স বর্ণনা করে একথার সাক্ষ্য প্রদান করেন যে তিনি মারা গেছেন আর কখনও আগমণকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং ইসরাইলী মসীহ্‌র পৃথক পৃথক দেহায়বয়ব বর্ণনা করে বুঝিয়ে দেন যে তিনি মারা গেছেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

খোদা তা'লার ত্রিশটি আয়াত আমার সমর্থনে রয়েছে। আমাকে কোথাও يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ (আলে ইমরান: ৫৬) আয়াত দ্বারা আবার কোথাও فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ এবং مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (আলে ইমরান: ১৪৫) আয়াত দ্বারা সমর্থন করেছে। বস্তুত, বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে আমার পক্ষে ঘোষণা দিচ্ছে যে এই পথটিই সত্য আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে যে পথের উপর আমি প্রতিষ্ঠিত রয়েছি আর এই পথেই রসুলুল্লাহ্ (সা.) হযরত মসীহ (আ.)কে হযরত এহিয়া (আ.)-এর সঙ্গে মেরাজের সময় দেখেছেন। আর একথা প্রমাণসিদ্ধ যে জীবিত ও মৃতদের মাঝে যে পার্থক্য থাকা উচিত তাদের দুজনের মাঝে সেই বিশেষ পার্থক্যের কথা বর্ণনা করা হয় নি। আঁ হযরত (সা.) কখনও তাঁর বয়স বর্ণনা করে একথার সাক্ষ্য প্রদান করেন যে তিনি মারা গেছেন আর কখনও আগমণকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং ইসরাইলী মসীহ্‌র পৃথক পৃথক দেহায়বয়ব বর্ণনা করে বুঝিয়ে দেন যে তিনি মারা গেছেন। এগুলি কুরআন ও হাদীসের সাক্ষী। এছাড়াও সমস্ত সাহাবাদের সাক্ষ্য পাওয়া যায় আঁ হযরত (সা.)-এর মৃত্যুর সময়, যখন ঘোষণা করা হয় যে সমস্ত নবী মৃত্যু বরণ করেছেন। হযরত উমর (রা.) রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্পর্কে বলেছিলেন তিনি (সা.) এখনও মৃত্যুবরণ করেন নি আর হযরত উমর তরবারি বের করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.) উঠে দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করলেন مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (আলে ইমরান: ১৪৫) সেই কিয়ামত সদৃশ মুহূর্তে যখন কি নবী করীম (সা.) পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন আর সমস্ত সাহাবাগণ একত্রিত হয়েছেন, এমনকি উসামা (রা.)-এর সৈন্যদলও রওনা হয় নি, হযরত উমর (রা.)-এর কথা শুনে হযরত আবু বাকার (রা.) উচ্চস্বরে বলে উঠলেন- 'মহম্মদ (সা.)-এর মৃত্যু হয়েছে'। আর একথার প্রমাণ দিতে তিনি 'মা মুহাম্মাদুন ইল্লা রসুল' আয়াত পেশ করেন। এখন যদি সাহাবা (রা.) -এর কল্পনাতেও হযরত ঈসা (আ.) জীবিত থাকতেন,তবে তারা অবশ্যই বলতেন, কিন্তু তারা নীরব থাকলেন আর বাজারে বন্দরে এই আয়াত পাঠ করে বেড়াতেন আর বলতেন এই আয়াতটি যেন আজকেই অবতীর্ণ হল।

আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি। সাহাবা (রা.) মুনাফিক ছিলেন না যে তারা হযরত আবু বাকার (রা.)এর ভয়ে চুপ ছিলেন আর আবু বাকার (রা)-এর কথা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি। আসল বিষয় এটিই ছিল যা হযরত আবু বাকার (রা.) বর্ণনা করেছেন। তাই সকলেই মাথা হেট করে ছিল। এটি ছিল সাহাবাদের ঐক্যমত। হযরত উমর (রা.) ও একথাই বলছিলেন যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) পুনরায় আগমণ করবেন। যদি এই যুক্তি পরিপূর্ণ না হত (আর পরিপূর্ণ তখনই হত যখন এক্ষেত্রে কোনও ব্যতিক্রম না থাকত। কেননা, যদি হযরত ঈসা আকাশে জীবিত চলে গিয়েছিলেন আর তার পুনরাগমণ নির্ধারিত ছিল, তবে এটি যুক্তি না হয়ে পরিহাস হয়ে দাঁড়াত) তবে হযরত উমর (রা.) নিজেই তা প্রত্যাখ্যান করতেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৭)

সত্যকে স্বীকার করতে হলে অনাড়ম্বরপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস অবলম্বন, জগতের মোহ থেকে দূরে থাকা এবং উচ্চাশা থেকে বিরত থাকা জরুরী। সত্যান্বেষী ব্যক্তির এই সব বিষয়গুলি থেকে বিরত থাকা জরুরী। কেউ যদি এই সব বিষয়গুলি থেকে বিরত না থাকে, তবে তার সত্যান্বেষণ বৃথা কর্ম।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হুজরাতের ২ নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন-

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এরা বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে এবং করবে। তবু তারা ইসলামের দিকে অগ্রসর হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে না। ইউরোপবাসীরা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে, কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। কেননা সমাজে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

বলা হয়েছে যে, তারা নিজেদের খাওয়া দাওয়ার কারণে, নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে এবং নিজেদের অলীক কামনা বাসনার কারণে মুসলমান হয় না। অর্থাৎ পূর্বের আয়াতের অর্থে যে প্রশ্ন উঠছিল তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ লোকেরা যখন কামনা করে এবং করবে, 'আমরা যদি মুসলমান হতাম! তারা মুসলমান হয় না কেন? বলা হয়েছে যে, তাদের বিলাসিতা, সম্পদের লোভ এবং দুরাশাই তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই আয়াত থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, সত্যকে স্বীকার করতে হলে অনাড়ম্বরপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস অবলম্বন, জগতের মোহ থেকে দূরে থাকা এবং উচ্চাশা থেকে বিরত থাকা জরুরী। সত্যান্বেষী ব্যক্তির এই সব বিষয়গুলি থেকে বিরত থাকা জরুরী। কেউ যদি এই সব বিষয়গুলি থেকে বিরত না থাকে, তবে তার সত্যান্বেষণ বৃথা কর্ম। তার কাছে সত্য

এরপর শেষের পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

পত্রাদি ও অনুষ্ঠানসমূহের প্রশ্নোত্তর পর্ব থেকে সংগৃহীত হুযুর আনোয়ার (আই.)–এর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহ

প্রশ্ন: এক ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন যে, তিনি নারীবাদি ভাবধারায় প্রভাবিত হতে শুরু করেছেন যা ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থী। তিনি আরও জানতে চান যে, মহিলা বিয়ের সময় নিজের মোহর নিজেই কেন নির্ধারণ করতে পারে না? নারীর নীরবতাকে কেন তার সম্মতি বলে ধরে নেওয়া হয়। নারীর লজ্জা ও নীরবতা কেন এত বেশি সমাদৃত হয়? অথচ আমরা এমন এক সমাজে বাস করি যেখানে নারীর সমান অধিকার নিয়ে কথা বলা হয়। তিনি এও জানতে চান যে নিকাহর সময় মহিলা যদি নিজে উপস্থিত না থাকে, সেক্ষেত্রে তার সম্মতির ব্যাপারে তার ওলী বা অভিভাবক ভুল বিবৃতিও তো দিতে পারে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২১ সালে ১৮ই জুন তারিখের চিঠিতে এর উত্তরে লেখেন- কোনও বিষয়ে চিন্তাধারা পোষণ করা বা কোনও বিষয় সম্পর্কে আপত্তির জন্ম হয় সাধারণত জ্ঞানের অভাব বা সে সম্পর্কে অসম্পূর্ণ তথ্যের কারণে। আর অনেক সময় আপত্তিকারী শোনা কথা বিশ্বাস করে আপত্তি করে থাকে। তাই কুরআন করীম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে, কোনও কাজ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সে সম্পর্কে যথাযথ গবেষণা কর। আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۭ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا (النساء:95)

অর্থ: হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সফর কর, তখন তোমরা ভালরূপে তদন্ত করিয়া লও, এবং যে তোমাদিগকে সালাম বলে, 'তাহাকে বলিও না যে তুমি মো'মেন নহ।' তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ কামনা করিতেছ, অথচ আল্লাহ্‌র নিকট রহিয়াছে প্রচুর সম্পদ। তোমরাও ইতিপূর্বে এইরূপ ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন, সুতরাং তোমরা ভালরূপে তদন্ত করিয়া লও। তোমরা যাহা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত আছেন।

(আন নিসা: ৯৫)

তিনি অন্যত্র বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰي مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যদি কোন দুষ্কৃতকারী তোমাদের নিকট কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ লইয়া আসে তাহা হইলে তোমরা ভালরূপে তদন্ত কর, যেন এইরূপ না হয় যে, অজ্ঞাতসারে তোমরা কোন জাতিকে কষ্ট দাও এবং পরে তোমরা যে (ভুল) কাজ কর উহার জন্য অনুতপ্ত হও।

(আল হুজরাত: ৭)

অতএব, ইসলাম তার অনুসারীদেরকে আপন পর সকলের প্রত্যেকটি বিষয়ে পুরো অনুসন্ধান করার করার নির্দেশ দিয়েছে আর পরিপূর্ণ বিশ্বাসের বিপরীতে সংশয়কে অপছন্দ করেছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا

অর্থ: নিশ্চয় অনুমান সত্যের মোকাবেলা কোন কাজে আসে না।

(সূরা ইউনুস: ৩৭)

সেই সঙ্গে কুরআন করীম একাধিক স্থানে এই বিষয়টিকেও একাধিক আঙ্গিকে বর্ণনা করেছে যে খোদা তা'লা এবং তাঁর রসুলকে প্রত্যাখ্যানকারীদের ধর্মের কখনও কোনও বিশ্বাস ভিত্তি নেই, তারা কেবল ধারণাগত এবং কাল্পনিক কথাবার্তা বলে থাকে।সেই কারণে কুরআন করীম মোমেনদেরকে ভিত্তিহীন ধারণা করা থকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর কোনও কোনও প্রকারের ধারণাকে পাপ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমনটি বলা হয়েছে-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ

অর্থ: হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা অতিরিক্ত সন্দেহকে পরিহার কর, কারণ কতক (ক্ষেত্রে) সন্দেহ পাপ বিশেষ।

(আল হুজরাত: ১৩)

আপনি বলেছেন যে মনের মধ্যে এমন সব চিন্তাধারার উদ্রেক ঘটছে যা ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থী। আপনি এও লিখেছেন যে, আপনি ইসলামী শিক্ষামালা সম্পর্কে গবেষণা করছেন। গবেষণা করা খুব ভাল অভ্যাস, কিন্তু এ প্রসঙ্গে একথাটিও দৃষ্টিপটে রাখা জরুরী যে আপনার গবেষণা কিসের উপর ভিত্তি করে হচ্ছে। কুরআন করীম, সুন্নত এবং হাদীসকে বোঝার জন্য আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে যে ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী হিসেবে পৃথিবীর সংশোধনের জন্য পাঠিয়েছেন। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ইসলামের সঠিক শিক্ষাকে পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। তাই আপনি আপনার গবেষণায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী অধ্যয়নকে প্রাধান্য দিন আর এগুলি বার বার অধ্যয়ন করুন। এরপর আহমদীয়াতের খলীফাদের পুস্তকাবলী অধ্যয়ন করলেও ইনশাআল্লাহ্ আপনার যাবতীয় সংশয় দূর হবে, যেগুলি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর উপর ভিত্তি করেই লেখা হয়েছে।

আর আপনার প্রশ্ন প্রসঙ্গে বলব যে এটিও বিভ্রান্তি ও ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে সম্যকরূপে অবগত না থাকার কারণেই এমন সন্দেহ জন্ম নেয়। ইসলামী শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে মেয়ের নিকাহর জন্য মেয়ের নিজের সম্মতি থাকা সব থেকে বেশি গুরুত্ব রাখে, কোনও নিকাহ-ই তার সম্মতি ছাড়া হতে পারে না। 'নীরবতাকেই তার সম্মতি বলে ধরে নেওয়া হয়'- এমন কথাও ভুল। নিকাহর জন্য যথারীতি মেয়ের সম্মতি নেওয়া হয়, শুধু তা নয়, নিকাহ ফর্মে মেয়ের স্বাক্ষর থাকে আর তার স্বাক্ষরের দুইজন সাক্ষীর এই মর্মে সাক্ষ্য থাকা জরুরী যে তাদের সামনে মেয়ে স্বেচ্ছায় নিকাহ ফর্মে স্বাক্ষর করেছে। নীরবতাকে সম্মতি হিসেবে ধরে নেওয়া ইসলামি শিক্ষা নয়, বরং এটা আঞ্চলিক প্রথার অন্তর্গত। তবে একথা ঠিক যে, মেয়ের নিকাহর জন্য তার সম্মতি ছাড়াও ইসলাম মেয়ের অভিভাবক অর্থাৎ তার অত্যন্ত কোনও নিকটের যেমন পিতা, ভাই ইত্যাদির সম্মতিকেও আবশ্যক করেছে। এই আদেশের মধ্যে একটি বিরাট প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে। যেহেতু মেয়ে এক বিয়ে করে এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারে যাচ্ছে, তাই সেই নিকাহতে অভিভাবক থাকার শর্ত অনিবার্য রেখে অপর পরিবারের নিকট একথা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে মেয়েরা যেহেতু সমাজে পুরুষদের তুলনায় দুর্বল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে, তাই মেয়ের শ্বশুর বাড়িকে এর মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হয়েছে যে যদি তার প্রতি কোনও অন্যায় বা অত্যাচার হয় সেক্ষেত্রে তাদের জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু অভিভাবকের এই শর্তটিকেও মেয়ের সম্মতির উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেটা এভাবে যে, যদিও অভিভাবক মেয়ের কোনও নিকট আত্মীয় হয়ে থাকে, যাকে তার হিতাকাঙ্খী হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কোনও মেয়ের পক্ষ থেকে কোনও অভিযোগ ওঠে যে তার অভিভাবক তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিতে চায়, সেক্ষেত্রে আঁ হযরত (সা.)-এর সুন্নত অনুসারে খলীফাতুল মসীহ্ তার আধ্যাত্মিক পিতা হিসেবে সেই মেয়ের রক্ত সম্পর্কীয় অভিভাবককে রহিত করে নিজের প্রতিনিধিত্বে একজন উকিল নিযুক্ত করবেন যে সেই মহিলার ইচ্ছানুসারে তার নিকাহ করানোর অধিকার লাভ করবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাত আহমদীয়া এই রীতি অনুসরণ করে আসছে আর অনেক আহমদী মেয়ে খলীফাতুল মসীহর মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায় করেছে। পরস্পরের সম্মতি আদান প্রদান সভাটি যেহেতু পুরুষদের হয়ে থাকে আর ইসলাম একাধিক তাৎপর্যপূর্ণ কারণে গয়ের মহররম পুরুষ ও মহিলাদের অবাধ মেলামেশাকে অপছন্দ করেছে। তাই ইসলাম মহিলাদের সম্মান ও সম্ভ্রমকে দৃষ্টিপটে রেখে মেয়ের স্বশরীরি উপস্থিতির পরিবর্তে তার অভিভাবককে সম্মতি আদান প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু এর পূর্বে নিকাহ্ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মেয়ের ইচ্ছে ও সম্মতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে হুযুর (সা.) একটি মেয়ের বিবাহ সম্পর্ক চূড়ান্ত করার পূর্বে যখন এক সাহাবীকে একবার মেয়েটিকে দেখার নির্দেশ দিলেন, তখন মেয়ের পিতা পরপুরুষকে মেয়ে দেখাতে অস্বীকার করল। কিন্তু মেয়েটি হুযুর (সা.)-এর নির্দেশ শুনে দরজর বাইরে বেরিয়ে এল আর সে সেই সাবাহীকে বলল, হুযুর (সা.) -এর যেহেতু নির্দেশ তাই তুমি আমাকে দেখতে পার।'

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবু নিকাহ)

অতএব, ইসলাম অন্যান্য আদেশাবলীর ন্যায় নিকাহ তথা বিয়ের বিষয়েও বৈধ সীমার মধ্যে থেকে মেয়েদেরকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করেছে। তবে ধর্ম বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেখানে মেয়েদের উপর কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, তেমনি পুরুষদের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু শয়তান

এরপর শেষের পাতায়

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

জুমআর খুতবা

স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবী (সা.)-এর সাথে আমাদেরকে বিশাল সৈন্যবাহিনীর কারণে বিজয় এবং সাহায্য দান করেন নি। আমাদের অবস্থা তো এমন ছিল যে, মহানবী (সা.)-এর সাথে আমরা যখন জিহাদ করতাম, তখন আমাদের কাছে মাত্র দু'টি ঘোড়া থাকতো এবং উটের ওপরও আমরা পালাক্রমে আরোহণ করতাম। উহুদের (যুদ্ধের) দিন আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম আর আমাদের কাছে একটি মাত্র ঘোড়া ছিল, যাতে মহানবী (সা.) আরোহিত ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয় দান করতেন এবং আমাদের সাহায্য করতেন।'

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদাবান সাহাবী এবং খলীফায়ে রাশেদ হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর যুগে বিদ্রোহী ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৬ শে আগস্ট , ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (২৬ জহুর , ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূ রা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,হযরত আবু বকর (রা.)'র সিরিয়া অভিমুখে প্রে রিত বিভিন্ন সেনাদলের উল্লেখ করা হচ্ছিল যা শত্রুর আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনটি (বাহিনীর)উল্লেখ গত খুতবায় করা হয়েছে আর চতুর্থ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আমর বিন আস (রা.)। এ সম্পর্কে লিখা রয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) একটি সেনাদল হযরত আমর বিন আস (রা.)'র নেতৃত্বে সিরিয়া অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত আমর বিন আস (রা.) সিরিয়া যাওয়ার পূর্বে কুযা'আ (অঞ্চলের) একাংশের যাকাত সংগ্রহের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। অপরদিকে কুযা'আর অন্য অর্ধ াংশের যাকাত সংগ্র হের জন্য হযরত ওয়ালীদ বিন উকবা (রা.) নিযুক্ত ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন সিরিয়ার অভিমুখে বিভিন্ন সেনাদল প্রেরণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন তখন তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল, হযরত আমর বিন আস (রা.)-কে সিরিয়াতে প্রেরণ করেন। কিন্তু তার কৃতিত্বের জন্য, অর্থাৎ হযরত আমর (রা.)'র অনন্য ভূমিকার জন্য যা তিনি ধর্মত্যাগের নৈরাজ্য দূর করার ক্ষেত্রে প্রদর্শন করেছিলেন, হযরত আবু বকর (রা.) তাকে এই অধিকার প্রদান করেন যে, তিনি চাইলে কুযা'আতে অবস্থান করতে পারেন অথবা সিরিয়া গিয়ে সেখানকার মুসলমানদের শক্তি বা মনোবল বৃদ্ধির কারণ হতে পারেন।

(আল বাদাইয়াতু ওয়ান নাহাইয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩) (হযরত আবু ব াকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৩৪০)

অতএব, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আমর বিন আস (রা.)-কে পত্র লিখেন, হে আবু আব্দুল্লাহ্! আমি তোমাকে এমন একটি কাজে নিয়োজিত করতে চাই যা তোমার ইহ ও পরকাল উভয়ের জন্য সর্বোত্তম, কিন্তু তুমি যে দায়িত্ব পালন করছ তা তোমার কাছে বেশি পছন্দনীয় হলে সেটি ভিন্ন কথা।

এর উত্তরে হযরত আমর বিন আস (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে লিখেন, আমি ইসলামেরতিরগুলোর মধ্যে একটি তিরমাত্র আর আল্লাহ্র পর আপনিই এমন বক্তি যিনি এসব তির পরিচালনা করার এবং একত্র করার অধিকার রাখেন। আপনি দেখুন! এগুলোর মধ্যে থেকে যে তিরটি অত্যন্ত দৃঢ়, অধিক ভয়ঙ্কর ও উন্নতমানের সেটিকে আপনি সেদিকে নিক্ষেপ করুন যেদিক থেকে আপনি কোনো শঙ্কা দেখতে পাচ্ছেন। (তারিখু তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩২)

অর্থাৎ, আমি সর্বাবস্থায় সব ধরনের বিপদসঙ্কুল পরিস্থি তিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি।

হযরত আমর বিন আস (রা.) মদীনায় এলে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে নির্দেশ প্রদান করেন, তিনি যেন মদীনার বাহিরে গিয়ে তাঁবুতে আশ্রয় গ্রহণ করেন বা শিবির স্থাপন করেন যাতে মানুষ তার কাছে সমবেত হতে পারে। কুরাইশদের মধ্য থেকে অনেক সম্ভ্রান্ত মানুষ তার সাথে গিয়ে যুক্ত হয়। অর্থাৎ, যখন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, সিরিয়া অভিমুখে যেতে হবে তখন আমর বিন আস (রা.)-কে মদীনায় ডেকে আনা হয়। (তিনি)সেখানে এলে তার সাথে এখানে সেনাদল গঠন করার জন্য হযরত আবু বকর (রা.) তাকে মদীনার বাইরে শিবির স্থাপন করতে বলেন যাতে মানুষ তার নিকট আসে। তিনি (রা.) যাত্রা করতে মনস্থ করলে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে বিদায় দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হন। (বিদায় জানানোর সময়) তিনি (রা.) বলেন, হে আমর! তুমি মতামত দেওয়ার ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ আর রণ-দূরদর্শিতার অধিকারী। তুমি তোমার জাতির সম্ভ্রান্ত লোক ও পুণ্যবান মুসলমানদের সাথে যাচ্ছো এবং নিজের ভাইদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে। তাই তাদের হিতসাধনে আলস্য দেখাবে না এবং তাদেরকে উত্তম পরামর্শ প্রদান করা থেকে বিরত থাকবে না। কেননা, তোমার মতামত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রশংসিত এবং পরিণামে আশিসপূর্ণ হতে পারে। পরামর্শ দেয়ার ক্ষেত্রে সুপরামর্শ দিতে কখনো বিরত থাকবে না। অর্থাৎ তোমার পক্ষ কোন প্রস্তাব থাকলে তুমি তা অবশ্যই দিবে। একথা শুনে হযরত আমর বিন আস (রা.) নিবেদন করেন, এটি আমার জন্য কতই না উত্তম হবে যখন আমি আপনার ধারণা সত্য প্রমাণ করে দেখাব আর আমার সম্পর্কে আপনার মতামত ভুল প্রমাণিত হবে না। হযরত আমর বিন আস (রা.) সেনাদল নিয়ে যাত্রা করেন। তার সৈন্যসংখ্যা ৬-৭ হাজারের মধ্যে ছিল এবং তাদের গন্তব্য ছিল ফিলিস্তিন।

হযরত আমর (রা.) এক হাজার মুজাহিদীন বিশিষ্ট সেনাদল প্রস্তুত করেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)'র নেতৃত্বে রোমে অগ্রাভিযানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এই সেনাদল রোমানদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং শত্রুর শক্তি চূর্ণ বিচুর্ণ করে তাদের ওপর বিজয় অর্জন করে আর কিছু বন্দিসহ ফিরে আসে।

হযরত আমর বিন আস (রা.) এসব বন্দিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন, রোমান সেনাবাহিনী রোভেসের নেতৃত্বে মুসলমানদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এসব তথ্যের ভিত্তিতে হযরত আমর (রা.) তার সেনাবাহিনীকে সুবিন্যস্ত করেন। (এরপর) যখন রোমানরা আক্রমণ করে তখন মুসলমানরা তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয় এবং রোমান সেনাবাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করে। এরপর (তিনি) তাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ করে শত্রুর শক্তিকে বিনাশ করেন এবং তাদেরকে পালাতে এবং যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। ইসলামী সেনাদল তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে আর রোমানদের সহস্র সহস্র সেনা নিহত হয়, আর এভাবেই এ যুদ্ধ সমাপ্ত হয়।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়্যত অউর কারনামে, প্রণেতা- আলি মহম্মদ সালাবী, পৃ: ৪৪৮-৪৪৯)এসব সেনাদল প্রেরণ করে হযরত আবু বকর (রা.) স্বস্তির নিঃশ্বাস নেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ্ এসব সেনাবাহিনীর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করবেন। এর কারণ ছিল, তাদের মাঝে এক সহস্রাধিক মুহাজির এবং আনসার সাহাবী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যারা প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরম বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা.)-এর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাদের মাঝে বদরের যু দ্ধে অংশগ্রহণ করা সেসব সাহাবীও ছিলেন যাঁদের সম্পর্কে তিনি (সা.) তাঁর প্রভুর সমীপে এই নিবেদন করেছিলেন যে, 'হে আল্লাহ্! আজ তুমি যদি এই ছোট্ট দলটিকে ধ্বংস করে দাও তাহলে ভবিষ্যতে আর কখনো পৃথিবীতে তোমার উপাসনা করা হবে না'।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৩২২)

এরপর লিখা রয়েছে, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস এ দিনগুলোতে ফিলিস্তিনে ছিল। মুসলমানদের প্রস্তুতির সংবাদ পাওয়ার পর সে অত্রাঞ্চলের নেতাদের সমবেত করে এবং তাদের সামনে জ্বালময়ী বক্তৃতা দিয়ে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে। সে মুসলমানদের সম্পর্কে বলে, এসব ক্ষুধার্ত, বস্ত্রহীন ও অভদ্র লোক আরবের মরুভূমি থেকে উঠে এসে তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে চায়। তোমরা তাদের এমন দাঁতভাঙ্গা জবাব দাও যেন তারা আর কখনো তোমাদের দিকে চোখ তুলে তাকানোরও সাহস না পায়। সমরাস্ত্র ও সৈন্যবাহিনী দিয়ে তোমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করা হবে। তোমাদের ওপর যেসব আমীর নিযুক্ত করা হয়েছে, তোমরা মন-প্রাণ দিয়ে তাদের আনুগত্য করো; তোমাদেরই জয় হবে। হিরাক্লিয়াস সেখানকার বাসিন্দাদের আরবের মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে বক্তব্য দেয়। ফিলিস্তিনের লোকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সম্মত করে হিরাক্লিয়াস দামেস্ক আসে আর সেখান থেকে হিমস এবং আন্তাকিয়ায় পৌঁছে। আর ফিলিস্তিনের মতো এসব অঞ্চলেও সে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বক্তৃতা দিয়ে সেখানকার লোকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সম্মত করে। আন্তাকিয়াকে হেডকোয়ার্টার বা কেন্দ্র বানিয়ে স্বয়ং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৩৪৭)

সিরিয়াতে রোমানদের দুটি সেনাদল ছিল। একটি ফিলিস্তিনে এবং দ্বিতীয়টি আন্তাকিয়াতে। এই দুটি সেনাদল নিম্নোক্ত স্থানসমূহে নিজেদের কেন্দ্র বানিয়ে রেখেছিল। প্রথম- আন্তাকিয়া। রোমান সাম্রাজ্যের যুগে এটি সিরিয়ার রাজধানী ছিল। দ্বিতীয়- কিন্নাসরীন। এটি সিরিয়ার সীমান্ত যা উত্তর পশ্চিমে পারস্যের সংলগ্ন। তৃতীয়- হিমস। এটি সিরিয়ার সীমান্ত যা উত্তর পূর্বে পারস্যের সংলগ্ন। চতুর্থ- ওমান। বালকার রাজধানী। এখানে সু দৃঢ় ও সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। পঞ্চম- আজনাদায়েন। এটি ফিলিস্তিনের দক্ষিণে রোমানদের সামরিক রাজধানী ছিল যা আরব ভূখণ্ডের পূর্ব ও দক্ষিণ সীমান্ত এবং মিশরের সীমানার সঙ্গে মিলিত হতো। ষষ্ঠ- কেসারিয়া। এটি ফিলিস্তিনের উত্তরে হাইফা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত এবং এর ধ্বংসাবশেষ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। রোমান হাইকমাণ্ড বা নেতৃত্বে র কেন্দ্র ছিল আন্তাকিয়া অথবা হিমস।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়্যত অউর কারনামে, আলি মহম্মদ সালাবী, পৃ: ৪৫০)

একটি রেওয়ায়েতে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, হিরাক্লিয়াস যখন ইসলামীসেনাদলের আগমণের সংবাদ পায় তখন প্রথমে সে তার জাতিকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়ে বলে, আমার মতামত হলো, তোমরা মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নাও। খোদার কসম! তোমরা যদি সিরিয়ার অর্ধেক উৎপাদিত (ফসলের) বিনিময়েও সন্ধি করোএবং তোমাদের কাছে অর্ধেক উৎপাদন এবং রোমান অঞ্চল থাকে তাহলে তাদের পুরো সিরিয়া এবং রোমের অর্ধাংশের মালিক হওয়ার চেয়ে এটি তোমাদের জন্য শ্রেয়। কিন্তু রোমবাসী উঠে চলে যায় এবং তারা তার কথায় কর্ণপাত করেনি। তাই সে তাদের একত্রিত করে হিমস নিয়ে যায় এবং সেখানে সে সেনাবাহিনী ও সৈন্যদল প্রস্তুত করতে শুরু করে। হিমসের পর হিরাক্লিয়াস আন্তাকিয়ায় যায়। যেহেতু তার কাছে অনেক বেশি সৈন্য ছিল তাই সে মনস্থ করে, মুসলমানদের প্রতিটি সেনাদলের বিপক্ষে পৃথক পৃথক সৈন্যদল প্রেরণ করবে যেন মুসলমান সেনাবাহিনীর প্রতিটি অংশকে তাদের প্রতিপক্ষের মাধ্যমে দুর্বল করে দেওয়া যায়। অতএব, সে তার ভাই তাযারেককে ৯০ হাজার সেনাসহ হযরত আমর (রা.)-কে মোকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করে এবং জারজা বিন তওযেলকে হযরত ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.)-কে মোকাবিলা করার জন্য প্রে রণ করে। অনুরূপভাবে ক্যায়কার বিন নাস্তুসকে ৬০ হাজার সেনাসদস্য সহ হযরত আবু উবায়দা (রা.)'র উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে এবং হযরত শুরাহ্বীল বিন হাসানা (রা.)-কে মোকাবিলা করার জন্য দুরাকিসকে প্রেরণ করে।

(আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৫) (হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- হায়কাল, পৃ: ৩৪৭)

হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ্ (রা.) যখন জাবীয়ার নিকটবর্তী ছিলেন তখন তার কাছে এক ব্যক্তি সংবাদ নিয়ে আসে, হিরাক্লিয়াস আন্তাকিয়াতে আছে এবং সে তোমাদের বিরুদ্ধে এত বিশাল সেনাদল প্রস্তুত করেছে যে, এর পূর্বে এত বিশাল সেনাদল তার পূর্বপুরুষদের মধ্য থেকে কেউই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করেনি।

তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে পত্র লিখেন, আমি এই সংবাদ পেয়েছি যে, রোমান সম্রাট হিরাক্লি য়াস সিরিয়ার একটি জনবসতি যাকে আন্তাকিয়া বলা হয় সেখানে এসে শিবির স্থাপন করেছে এবং নিজ সাম্রাজ্যের লোকদের কাছে দূত প্রেরণ করেছে যেন তাদের জড়ো করে নিয়ে আসে। অতএব, মানুষ প্রত্যেক দুর্গম ও সুগম পথ পাড়ি দিয়ে হিরাক্লিয়াসের কাছে এসেছে। তাই এ বিষয়ে আমি আপনাকে অবগত করা সঙ্গত মনে করলাম যেন এ বিষয়ে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে উত্তরে লিখেন, আমি তোমার পত্র পেয়েছি। তুমি রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস সম্পর্কে যা লিখেছ আমি তা বুঝতে পেরেছি। পুনরায় বলেন, আন্তাকিয়াতে তার অবস্থান – তার ও তার সঙ্গীদের পরাজয় এবং এতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমার ও মুসলমানদের বিজয় নিহিত রয়েছে। ভয়ের কোন কারণ নেই। তুমি হিরাক্লিয়াসের নিজ সাম্রাজ্যের লোকদের একত্রিত করার এবং বিশাল সংখ্যায় মানুষজনের সমবেত হওয়া সম্পর্কে যা লিখেছ তা আমি এবং তুমি আগে থেকেই জানি যে, সে এমনটি করবে। কেননা, কোন জাতিই যুদ্ধ ছাড়া তার বাদশাহ্ কে পরিত্যাগ করতে পারে না আর নিজেদের দেশ থেকেও বের হতে পারে না। পুনরায় তিনি (রা.) লিখেন, আলহামদুলিল্লাহ্ আমি জানি, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেওয়া অনেক মুসলমান মৃত্যুকে ততটাই ভালোবাসে যতটা শত্রুরা জীবনকে ভালোবাসে এবং নিজেদের যুদ্ধের (বিনিময়ে) আল্লাহ্র কাছে মহা প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখে এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্ বা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকে তারা কুমারী নারী এবং মূল্যবান সম্পদের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। তাদের মাঝে একজন মুসলমান যুদ্ধের সময় সহস্র মুশরিকের চেয়ে উত্তম। তুমি তোমার সেনাদল নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো এবং যেসব মুসলমান তোমাদের মাঝে অনুপস্থিত তাদের জন্য চিন্তিত হয়ো না। নিশ্চয় মহা সম্মানিত আল্লাহ্ তোমাদের সাথে আছেন এবং একইসাথে আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য আরো লোক প্রেরণ করছি, অর্থাৎ, আরো সেনাসদস্য প্রেরণ করছি যা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে এবং এরপর আর অতিরিক্ত (সেনার) বাসনা থাকবে না। ওয়াস্সালাম।

(তারিখুল খামিস, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১২-২১৩)

অনুরূপভাবে হযরত আমর বিন আস (রা.)'র পত্রও হযরত আবু বকর (রা.) পান। হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে লিখেন, 'আমি তোমার পত্র পেয়েছি, যাতে তুমি রোমানদের সেনা-সমাবেশ করার কথা উল্লেখ করেছ। স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবী (সা.)-এর সাথে আমাদেরকে বিশাল সৈন্যবাহিনীর কারণে বিজয় এবং সাহায্য দান করেন নি। আমাদের অবস্থা তো এমন ছিল যে, মহানবী (সা.)-এর সাথে আমরা যখন জিহাদ করতাম, তখন আমাদের কাছে মাত্র দু'টি ঘোড়া থাকতো এবং উটের ওপরও আমরা পালাক্রমে আরোহণ করতাম। উহুদের (যুদ্ধের) দিন আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম আর আমাদের কাছে একটি মাত্র ঘোড়া ছিল, যাতে মহানবী (সা.) আরোহিত ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয় দান করতেন এবং আমাদের সাহায্য করতেন।' তিনি বলেন, 'হে আমর! স্মরণ রেখো, আল্লাহ্র সবচেয়ে অনুগত সে যে পাপকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে। নিজেও আল্লাহ্র আনুগত্য করো এবং নিজের সঙ্গীদেরও আল্লাহ্র আনু গত্য করার নির্দেশ দাও।'

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসীয়্যত অউর কারনামে, প্রণেতা- আলি মহম্মদ সালাবি, পৃ: ৪৫২-৪৫৩)

হযরত ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ানও হযরত আবু বকর (রা.)-কে পত্র মারফৎ সেখানকার পরিস্থি তি জানিয়ে সাহায্যের আবেদন করেন। এর উত্তরে হযরত আবু বকর (রা.) লিখেন, 'যখন তাদের সাথে তোমার মোকাবিলা হবে তখন নিজ সঙ্গীদের নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে; আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের অপদস্থ করবেন না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্র নির্দেশে ছোট দল বড় দলের ওপর বিজয় লাভ করে। এতদসত্ত্বেও আমি তোমাদের সাহায্যার্থে উপর্যুপরি মুজাহিদদের দল প্রেরণ করবযতক্ষণ পর্যন্ত না তা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয় আর তোমরা অতিরিক্ত (সৈন্যের) প্রয়োজন অনুভব করবে না, ইনশাআল্লাহ্। ওয়াসসালাম।' (নীচে) হযরত আবু বকর (রা.) স্বাক্ষর করেন।

হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কুর্দকে এই পত্র হযরত ইয়াযীদেরকাছে নিয়ে যাবার জন্য দেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ তাঁর পত্র নিয়ে যাত্রা করেন এবং তিনি হযরত ইয়াযীদের কাছে পৌঁছেন আর এই পত্র মুসলমানদের সামনে পাঠ করেন, যাতে মুসলমানরা খুবই আনন্দিত হন। (তারিখুল খামিস, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১৩)

হযরত আবু বকর (রা.), হাশেম বিন উতবাকে ডাকেন এবং তাকে বলেন, 'হে হাশেম! নিশ্চয়ই এটি তোমার সৌভাগ্য যে, তুমি সেসব

মানুষের অন্তর্ভুক্ত যাদের মাধ্যমে উম্মত তার মুশরিক শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে সাহায্য লাভ করছে এবং যাদের শুভাকাঙ্ক্ষা, সুপরামর্শ, পবিত্রতা ও রণনৈপুণ্যের ওপর শাসকের বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.), হাশেমকে অর্থাৎ যাকে এই সেনাদল প্রস্তুত করার জন্য পাঠাচ্ছিলেন, তাকে বলেন; মুসলমানরা আমাকে চিঠি লিখে তাদের কাফির শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রেরণের অনুরোধ করেছে। তাই তুমি নিজ সঙ্গীদের নিয়ে তাদের কাছে যাও; আমি লোকজনকে তোমার সাথে যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করছি। তুমি এখান থেকে রওয়ানা হয়ে আবু উবায়দার সাথে গিয়ে মিলিত হও।' হযরত আবু বকর (রা.) জনতার মাঝে দণ্ডায়মান হন এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন; এরপর বলেন, 'পরসমাচার,নিশ্চয়ই তোমাদের মুসলমান ভাইদের কেউ কেউ নিরাপদে আছে, কেউ কেউ আহত রয়েছে যাদের শুশ্রূষা করা হচ্ছে এবং তাদের সেবাযত্ন করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা শত্রুর হৃদয়ে তাদের প্রতাপ সৃষ্টি করেছেন, (তাই) তারা নিজেদের দুর্গসমূহে আশ্রয় নিয়ে সেগুলোর দ্বারবন্ধ করে দিয়েছে।

মুসলমানদের পক্ষ থেকে বার্তাবাহক এই সংবাদ নিয়ে এসেছে যে, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাদের সামনে থেকে পালিয়ে সিরিয়ার প্রান্তে একটি জনপদে আশ্রয় নিয়েছে। তারা আমাদেরকে এই সংবাদ পাঠিয়েছে যে, হিরাক্লিয়াস সেখান থেকে অনেক বড় একটি সৈন্যদল মুসলমানদের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছে। তোমাদের মুসলমান ভাইদের সাহায্যার্থে তোমাদের সেনাদল প্রেরণ করা হলো আমার সংকল্প।আল্লাহ্ তা'লা এদের মাধ্যমে তাদের পেছনের অংশকে শক্তিশালী করবেন। [অর্থাৎ এই বাহিনীর মাধ্যমে মুসলমানদের পেছন দিক সু দৃঢ় করবেন] এবং শত্রুকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তাদের হৃদয়ে এর (মাধ্যমে) ত্রাস সঞ্চার করবেন। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি সদয় হোন। হাশেম বিন উতবার সাথে প্রস্তুত হয়ে যাও এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পুরস্কার ও কল্যাণের আশা রাখো। যদি তুমি সফল হও তাহলে বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ হবে, আর যদি মৃত্যু বরণ করো তাহলে শাহাদত ও মর্যাদা লাভ হবে।'

এরপর হযরত আবুবকর (রা.) নিজের বাড়ি ফিরে আসেন এবং মানুষজন হাশেম বিন উতবার কাছে জড়ো হতে থাকে, এমনকি তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। (তাদের সংখ্যা) এক হাজার হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) তাদেরকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন। হাশেম হযরত আবু বকর(রা.)-কে সালাম করে বিদায় গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে বলেন, হে হাশেম! আমরা প্রবীণ ও বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত, পরামর্শ ও সুপরিকল্পনা দ্বারা উপকৃত হতাম এবং যুবকদের ধৈর্য, শক্তি ও বীরত্বের ও পর আস্থা রাখতাম। আর আল্লাহ্ তা'লা তোমার মাঝে এসব গুণের সমাহার ঘটিয়েছেন। তুমি এখন যুবক এবং কল্যাণের দিকে অগ্রসরমান।

শত্রুর সাথে যুদ্ধ হলে দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করবে এবং ধৈর্য প্রদর্শন করবে আর স্মরণ রেখো যে, আল্লাহ্‌র পথে যে পদক্ষেপই তুমি গ্রহণ করবে, যা-ই খরচ করবে, আর যে পিপাসা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় তুমি কাতর হবে- এর প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা তোমার আমলনামায় পুণ্যকর্ম লিখবেন। আল্লাহ্ তা'লা অনু গ্রহশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

হাশেম নিবেদন করেন, যদি আল্লাহ্ আমার জন্য মঙ্গল চান তাহলে আমি এমনটিই করব। শক্তি ও সামর্থ্য আল্লাহ্ তা'লাই দান করেন। আর আমি আশা রাখি যে, আমি যদি নিহত না হই তবে আমি তাদের সাথে লড়াই করব, আবার তাদের সাথে লড়াই করব, পুনরায় তাদের সাথে লড়াই করব। অতঃপর বলেন, আমি আশা করি, আমি যদি নিহত না হই তাহলে আমি তাদের সাথে বারবার লড়াই করব; অথবা তিনি একথা বলেছেন যে, আমার আকঙ্ক্ষা থাকবে আমি যেন নিহত হই এবং বারবার নিহত হই। এই হলো দুটি রেওয়ায়েত। অতঃপর তার চাচা হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস তাকে বলেন, হে ভাতিজা! তুমি যে বর্শা-ই নিক্ষেপ করবে আর যে আঘাতই হানবে সেটির উদ্দেশ্য যেন খোদার সন্তুষ্টি হয়। আর জেনে রাখো যে, তুমি অতি শীঘ্র ই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছ এবং অচিরেই আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাবর্তন করতে যাচ্ছ। আর ইহজগৎ থেকে পরকাল পর্যন্ত তোমার সাথে থাকবে সত্যনিষ্ঠ সেই পদক্ষেপ, যা তুমি উঠিয়ে থাকবে অথবা সৎকর্ম থাকবে যা তুমি সম্পাদন করেছ।

হাশেম বলেন, চাচাজান! আপনি আমার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিন্ত থাকুন। যদি (কোথাও) আমার অবস্থান ও সফর, সকাল-সন্ধ্যার গতিবিধি, চেষ্টাপ্রচেষ্টা করা, সামরিক অভিযান পরিচালনা করা এবং নিজ বর্শা দ্বারা আঘাতকরা আর নিজ তরবারি দ্বারা আঘাত করা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে হয় তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। অর্থাৎ, আমার প্রতিটি কর্ম আল্লাহ্‌র খাতিরেই হবে, মানুষের জন্য নয়। তারপর (তিনি) হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছ থেকে যাত্রা করেন এবং হযরত আবু উবায়দা (রা.)'র পথ ধরে তার কাছে পৌঁছে যান। তার আগমনে মুসলমানরা আনন্দিত হয় এবং পরস্পরকে তার আগমনের সুসংবাদ দিতে থাকে।

হযরত সাঈদ বিন আমের বিন হুযায়েম এই সংবাদ লাভ করেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) তাকে সিরিয়ার জিহাদে প্রে রণ করতে ইচ্ছুক। এটি হযরত আবু বকর (রা.) আরেকটি সেনাদল প্রস্তুত করছিলেন। হযরত সাঈদ বিন আমের (রা.)'র ধারণা ছিল যে, এই (দল) তার নেতৃত্বে যাত্রা করবে। যাহোক, তিনি এই সংবাদ লাভ করেন। তবে হযরত আবু বকর (রা.) যখন কিছুটা বিলম্ব করেন এবং কিছু দিন তার কাছে এর উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকেন তখন হযরত সাঈদ হযরত আবু বকর (রা.)'র সমীপে এসে নিবেদন করেন, হে আবু বকর (রা.)! আল্লাহ্‌র কসম, আমি এই সংবাদ পেয়েছিলাম যে, আপনি আমাকে রোমানদের অভিমুখে প্রেরণের ইচ্ছা রাখেন। কিন্তু এরপর আমি দেখছি যে, আপনি নীরবতা অবলম্বন করছেন। আমি জানি না আমার সম্পর্কে আপনার হৃদয়ে কীধারণা সৃষ্টি হয়েছে। আপনি যদি আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে আমীর নিযুক্ত করে প্রেরণ করতে চান তাহলে আমাকে তার সাথে প্রে রণ করুন। আমার জন্য এর চেয়ে অধিক আনন্দের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। আর আপনি যদি কাউকেই প্রেরণ না করতে চান তাহলে আমি জিহাদের আগ্রহ রাখি। আপনি আমাকে অনুমতি দিন যেন আমি গিয়ে মুসলমানদের সাথে যোগ দিতে পারি। আল্লাহ্ আপনার প্রতি সদয় হোন, আমার কাছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রোমানরা অনেক বিশাল সেনাদল সমবেত করেছে। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে সাঈদ বিন আমের! সকল কৃপাকারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কৃপাকারী তোমার প্রতি দয়া করুন। আমি তোমাকে যতটুকু চিনি, তোমাকে বিনয় অবলম্বনকারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী, প্রভাতে তাহাজ্জুদ আদায়কারী এবং অধিকহারে আল্লাহ্‌কে স্মরণকারীদের মাঝে গণ্য করা হয়।

তখন হযরত সাঈদ (রা.) তাঁর সমীপে নিবেদন করেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনার প্র তি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। আমার প্রতি এর চেয়েও বেশি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি রয়েছে। তাঁরই অনুগ্রহ ও কৃপা (রয়েছে)। খোদার কসম! আমি যতটুকু আপনাকে চিনি, আপনি সত্যকে স্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী, ন্যায়ের সাথে দৃঢ় অবস্থানকারী, মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু (আর) কাফিরদের বিরুদ্ধে খুবই কঠোর। আপনি ন্যায়ের ভিত্তিতে মীমাংসা করেন এবং ধনসম্পদ বিতরণের সময় কাউকে প্রাধান্য দেন না। তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাকে বলেন, থামো হে সাঈদ, থামো! আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদয় হোন। যাও এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। আমি সিরিয়ায় অবস্থিত মুসলমানদের নিকট একটি সেনাদল প্রেরণ করতে যাচ্ছি এবং তাদের ওপরে আমি তোমাকে আমীর নিযুক্ত করছি। অতঃপর তিনি হযরত বেলাল (রা.)-কে নির্দেশ দেন তিনি যেন লোকদের মাঝে (এটি) ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, হে মুসলমানেরা! হযরত সাঈদ বিন আমের বিন হিযিয়ামের সাথে সিরিয়ায় অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। কিছুদিনের মধ্যে তার সাথে সাতশ' জন প্রস্তুত হয়ে যায় এবং হযরত সাঈদ যখন যাত্রা করার সংকল্প করেন তখন হযরত বেলাল (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর খলীফা! আমাকে যদি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরেই মুক্ত করে থাকেন যাতে আমি স্বয়ং আমার মালিক থাকি এবং কল্যাণকর কাজে যোগদান করি তাহলে আপনি আমাকে অনুমতি দিন যেন আমি আমার প্রভুর রাস্তায় জিহাদ করি। বেকার থাকার চেয়ে আমার কাছে জিহাদ বেশি প্রিয়।

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা সাক্ষী আছেন যে, আমি তাঁর সন্তুষ্টির খাতিরেই তোমাকে স্বাধীন বা মুক্ত করেছিলাম এবং আমি এর বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে কোনো প্র কার প্রতিদান কিংবা কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করি না। এই পৃথিবী অনেক বিস্তৃত। অতএব, যে পথ তুমি পছন্দ করো সে পথেই চলো। হযরত বেলাল (রা.) নিবেদন করেন, হে সিদ্দীক! সম্ভবত আপনি আমার এ কথা অপছন্দ করেছেন এবং আমার প্র তি অসন্তুষ্ট। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, না, খোদার কসম! আমি এ কথায় অসন্তুষ্ট নই। আমি চাই, তুমি আমার ইচ্ছার কারণে নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ না করো। কেননা, তোমার আকাঙ্ক্ষা তোমাকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করে। হযরত বেলাল (রা.) নিবেদন করেন, আপনি যদি চান তাহলে আমি আপনার কাছেই থেকে যাই। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তোমার জিহাদ করার আকাঙ্ক্ষা থাকলে আমি তোমাকে কখনো (এখানে) অবস্থান করার আদেশ দিবো না। আমি কেবল তোমাকে আযান দেওয়ার জন্য চাই এবং হে বেলাল! তোমার বিচ্ছেদে আমি আতঙ্ক অনুভব করি

কিন্তু এমন বিচ্ছেদও আবশ্যক যার পর কিয়ামত পর্যন্ত আর সাক্ষাৎ হবে না। হে বেলাল! তুমি সৎকর্ম করতে থাকবে, এই পৃথিবীতে তোমার পাথেয় হবে সৎকর্ম এবং যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে একারণে আল্লাহ্ তোমার স্মরণকে অম্লান রাখবেন আর যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন এর সর্বোত্তম প্রতিদান দিবেন। হযরত বেলাল (রা.) তাঁর সমীপে নিবেদন করেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে সেই বন্ধু ও ভাইয়ের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

খোদার কসম! আপনি আমাদের আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্যের খাতিরে ধৈর্য ধারণের এবং সত্যকে সৎকর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ দিয়েছেন এটি কোনো নতুন বিষয় নয়। আর আমি মহানবী (সা.)-এর (তিরোধানের) পর অন্য কারো জন্য আযান দিতে চাই না।

অতঃপর হযরত সাঈদ বিন আমের (রা.)'র সাথে হযরত বেলাল (রা.)ও রওয়ানা হয়ে যান।

(আল ইকতিফা বিমা তাযমিনাহু মিন মাগাযি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১ম ভাগ, পৃ: ১৩০-১৩২)

তিনি এটিও নিবেদন করেন যে, কেবল আযানের কারণেই যদি (এখানে) থাকতে হয় তাহলে আমার আকাঙ্খা হলো, আমি আযান দিব না। কেননা, মহানবী (সা.)-এর পর অন্য কারো জন্য আযান দিতে আমার মন সায় দেয় না। এরপর হযরত আবু বকর (রা.)'র নিকট আরো মানুষ জড়ো হয়। তিনি (রা.) হযরত মুআবিয়া (রা.)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেন এবং তাদেরকে তার ভাই হযরত ইয়াযীদ-এর সাথে মিলিত হওয়ার আদেশ দেন। হযরত মুআবিয়া যাত্রা করে হযরত ইয়াযিদ -এর সাথে গিয়ে মিলিত হন। হযরত মুআবিয়া যখন হযরত খালিদ বিন সাঈদ-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন তখন তাদের অবশিষ্ট সেনারাও হযরত মুআবিয়া (রা.)'র সাথে যোগ দেয়। (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৩)

এরপর হামযা বিন আবু বকর হামদানী একটি সেনাদল নিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)'র সমীপে উপস্থিত হন। এই সেনাদলের সংখ্যা প্রায় এক হাজার কিংবা এর চেয়েও বেশি ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের সংখ্যা এবং প্রস্তুতি দেখে অত্যন্ত খুশি হন এবং বলেন, মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্র এই অনুগ্রহের কারণে সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য নিবেদিত। আল্লাহ্ সর্বদা সেসব মানুষের মাধ্যমে মুসলমানদের সাহায্য করত তাদের (আত্মিক) প্রশান্তির উপকরণ সৃষ্টি করতে থাকেন। তাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের সুদৃঢ় করেন এবং তাদের শত্রুর শক্তি খর্ব করেন।

এরপর হামযা হযরত আবু বকর (রা.)'র সমীপে নিবেদন করেন, আপনি ছাড়া আমার ওপর আর কেউ আমীর হবেন কী? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, জ্বি; আমি তিনজন আমীর নিযুক্ত করেছি । তুমি তাদের মধ্য হতে যার সাথে ইচ্ছা গিয়ে মিলিত হও। এরপর যখন হামযা মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের কাছে জানতে চান যে, এই আমীরদের মাঝে কোন আমীর সবচেয়ে শ্রেয় এবং মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যের নিরিখে সব থেকে উন্নত মানের। তখন তাকে বলা হয়, হযরত উবায়দা বিন জারাহ্। অতএব, তিনি তার সাথে গিয়ে মিলিত হন। এটিও এসব মানুষের রসূল প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ছিল। অর্থাৎ, যে মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে নিকটে ছিল আমি তার সাথে থাকব।

মদীনায় জিহাদী প্রতিনিধিদলের আগমন অব্যাহত থাকে এবং হযরত আবু বকর (রা.) তাদের বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করতেন। অপরদিকে হযরত আবু উবায়দা (রা.) নিয়মিত হযরত আবু বকর (রা.)-কে পত্র লিখতে থাকেন। রোমানরা এবং তাদের অধীনস্ত গোত্রগুলো মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বিশাল সংখ্যায় সমবেত হচ্ছে তাই আমাকে বলুন যে, এমতাবস্থায় কি করা উচিত?

(আল ইকতিফা বিমা তাযমিনাহু মিন মাগাযি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১ম ভাগ, পৃ: ১৩৩-১৩৬)

হযরত আবু উবায়দা (রা.)'র উপর্যুপরি চিঠিপত্রের কারণে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে সিরিয়া প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই খালিদ বিন ওয়ালীদের মাধ্যমে রোমানদেরকে তাদের শয়তানী চিন্তাধারা বা কুমন্ত্রণা ভুলিয়ে ছাড়ব। হযরত খালিদ (রা.) তখন ইরাকে ছিলেন। যখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে সিরিয়া যাওয়ার এবং সেখানে ইসলামী সেনাদলগুলোর নেতৃত্বভার গ্রহণের নির্দেশ দেন তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে লিখেন, পরসমাচার; আমি সিরিয়ায় শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্বভার খালিদকে অর্পণ করেছি। তুমি তার বিরোধিতা করবে না। তার কথা মানবে এবং তার নির্দেশ পালন করবে। আমি তাকে তোমার ওপরে এজন্য নিযুক্ত করিনি যে, তুমি আমার কাছে তার থেকে উত্তম নও কিন্তু আমার মতে যে রণনৈপুণ্য তার রয়েছে তা তোমার নেই। আল্লাহ তা'লা আমাদের এবং তোমার জন্য কল্যাণেরই সংকল্প করুন। ওয়াস্সালাম।

(আল ইকতিফা বিমা তাযমিনাহু মিন মাগাযি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১ম ভাগ, পৃ: ১৪৮) (তারিখুল খামিস, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২২০)

হযরত খালিদের ইরাক থেকে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হওয়া সম্পর্কে লিখা আছে যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র চিঠি যখন হযরত খালিদ পান তখন তিনি বিভিন্ন রেওয়ায়েত অনুসারে আটশ, ছয়শ বা পাঁচশ বা নয় হাজার বা ছয় হাজার (অর্থাৎ কয়েক হাজারের উল্লেখ আছে) সেনাদল নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে শত শত সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায় কোন কোনটিকে হাজার হাজার (সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়)। যাহোক, তিনি সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ যখন কুরাকার নামক স্থানে পৌঁছেন তখন তিনি সেখানকার লোকদের ওপর আক্রমণ করেন এরপর সেখান থেকে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে অত্যন্ত কষ্টকর সফর করার পর নিজের কালো রঙের পতাকা উড়িয়ে দামেস্কের নিকটবর্তী 'সানীয়াতুল উকাব'-এ পৌঁছেন।

এ সম্পর্কে অর্থাৎ এই পতাকার সম্পর্কে লিখা আছে যে, এটি মহানবী (সা.)-এর পতাকা ছিল যার নাম ছিল উকাব। এই পতাকার কারণে সেই ঘাঁটি বা উপত্যকার নাম সানীয়াতুল উকাব আখ্যায়িত হয়।

(আল কামিলু ফিততারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৬-২৫৮) (আবু বাকার সিদ্দীকে আকবর, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হায়কাল, অনুবাদক, শেখ মহম্মদ আহমদ পানিপতি, পৃ: ৩৫০)

এরপর দামেস্কের পূর্ব দিকের ফটকের এক মাইল দূরত্বের একটি স্থানে হযরত খালিদ শিবির স্থাপন করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু উবায়দা তার সাথে এখানেই মিলিত হয়েছিলেন। আর শত্রুকে অবরোধ মূলত সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত খালিদ দামেস্কের সামনে বেশি দিন অবস্থান করেননি। বরং সামনে অগ্রসর হয়ে কিনাতে বুসরা পৌঁছেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ মুসলমানদের সাথে যখন বুসরা পৌঁছেন তখন সকল সেনা এখানে সমবেত হয় আর এখানকার যুদ্ধে সবাই তাকে নিজেদের আমীর মনোনীত করেন। তিনি শহর অবরোধ করেন। কেউ কেউ বলেন যে, এই যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন হযরত ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান কেননা এটি দামেস্কের আয়ত্তাধীন ছিল, (আর) তিনি ছিলেন এর গভর্নর ও নেতা। এখানকার বাসিন্দারা এ মর্মে সন্ধিচুক্তি করে যে, তারা মুসলমানদেরকে জিযিয়া (তথা কর) প্রদান করবে আর মু সলমানরা তাদের প্রাণ, ধনসম্পদ এবং তাদের সন্তান-সন্ততির নিরাপত্তা বিধান করবে।

(ফুতুহুল বুলদান লিল বালাযারি, পৃ: ১৭৪) (হযরত আবু বাকার সিদ্দীকে আকবর, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হায়কাল, অনুবাদক- শেখ মহম্মদ আহমদ পানিপতি, পৃ: ৩৫১)

এরপর আজনাদায়েন-এর যুদ্ধাভিযান অথবা আজনাদীন- দু 'ভাবেই লেখা আছে। এ সম্পর্কে লেখা আছে যে, ফিলিস্তিনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর মাঝে এটি একটি বিখ্যাত জনপদের নাম।

(মুজামুল বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২৯)

বুসরা বিজয়ের পর হযরত খালিদ (রা.), হযরত আবু উবায়দা, হযরত শুরাহ্বীল, হযরত ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান প্রমুখকে সাথে নিয়ে হযরত আমর বিন আস'কে সহায়তার লক্ষ্যে ফিলিস্তিন অভিমু খে যাত্রা করেন। হযরত আমর সে সময় ফিলিস্তিনের নিম্নাঞ্চলে অবস্থান করছিলেন। তিনি ইসলামী সেনাদলের সাথে এসে যুক্ত হতে চাচ্ছিলেন কিন্তু রোমান সেনাদল তার পশ্চাদ্ধাবন করছিল এবং তাকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করতে সচেষ্ট ছিল। রোমানরা যখন মুসলমানদের আগমন সম্পর্কে জানতে পারে তখন তারা আজনাদায়েন এর দিকে সরে যায়। হযরত আমর বিন আস যখন ইসলামী সেনাদল সম্পর্কে অবগত হন তখন তিনি সেখান থেকে যাত্রা করেন এবং ইসলামী সেনাদলের সাথে গিয়ে মিলিত হন, এরপর সবাই আজনাদায়েন নামক স্থানে গিয়ে সমবেত হন এবং রোমানদের সম্মুখে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়।

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola (Murshidabad)**

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৬-৩৪৭) (আল খলীফাতুল আওয়াল আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়্যতু ওয়া আসরুহ, পৃ: ৩১২)

অপর একটি রেওয়ায়েত এমনও আছে যে, সে মোতাবেক আজনাদায়েন যাওয়ার পূর্বে হযরত খালিদ বুসরার পরিবর্তে দামেস্ক অবরোধ করেছিলেন আর হযরত আবু উবায়দাও তার সঙ্গে ছিলেন। এই অবরোধের সময় হিরাক্লিয়াস দামেস্কবাসীদের সাহায্যার্থে একটি সেনাদলও প্রেরণ করেছিল যাদের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ হয়েছিল। যাহোক,এটি পরবর্তীতে দামেস্ক জয়ের প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করা হবে।

(হযরত সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হায়কাল, পৃ: ৩৭৯-৩৮০)

যাহোক, দামেস্ক অবরোধের সময় হযরত খালিদ এবং হযরত উবায়দা জানতে পারেন যে, হিমসের শাসক একটি সেনা-সমাবেশ করেছে যাতে হযরত শুরাহ্বীল বিন হাসানার পথে হস্তক্ষেপ করতে পারে যিনি সেসময় বুসরায় অবস্থান করছিলেন। আর রোমানদের একটি বিশাল সেনাদল আজনাদায়েন নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেছে। এই সংবাদ হযরত খালিদ এবং হযরত আবু উবায়দাকে উৎকণ্ঠিত করে কেননা, তারা তখন দামেস্কবাসীর সাথে যুদ্ধরত ছিলেন। তখন হযরত খালিদ এবং হযরত আবু উবায়দা পরস্পর পরামর্শ করেন। হযরত আবু উবায়দা বলেন, আমার পরামর্শ হলো, আমরা এখান থেকে রওয়ানা হই এবং শত্রু হযরত শুরাহ্বীলের কাছে পৌঁছার পূর্বেই আমরা তার কাছে পৌঁছে যাব। হযরত খালিদ বলেন, আমরা যদি হযরত শুরাহ্বীলের দিকে অগ্রসর হই তাহলে আজনাদায়নে অবস্থানরত রোমান সেনাদল আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে তাই আমার পরামর্শ হলো, আমরা এই বিশাল সেনাদল অভিমুখে এগোই যারা আজনাদায়নে ঘাঁটি গেঁড়েছে আর হযরত শুরাহ্বীলের কাছে সংবাদ প্রেরণ করি এবং তার উদ্দেশ্যে ধাবমান শত্রুদলের গতিবিধি সম্পর্কে তাকে অবগত করি এবং তাকে বলি যে, তিনি যেন আজনাদায়নে এসে আমাদের সাথে মিলিত হন। একইভাবে আমরা হযরত ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান এবং হযরত আমরকেও সংবাদ পাঠাবো যে, তারা যেন আজনাদায়নে এসে আমাদের সাথে মিলিত হন, এরপর আমরা (সম্মিলিতভাবে) শত্রুর মোকাবিলা করব। তখন হযরত আবু উবায়দা বলেন, (আপনার) এই পরামর্শ অতি উত্তম, আল্লাহ্ এতে বরকত দিন। এ অনুযায়ী আমল করুন।

এক রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আবু উবায়দা হযরত খালিদকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, আমাদের সৈন্যরা সিরিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তাই তাদের সবাইকে পত্র লেখা হোক, তারা যেন আমাদের সাথে আজনাদায়েন-এ এসে মিলিত হয়। অতএব, হযরত খালিদ যখন দামেস্ক থেকে আজনাদায়েন অভিমুখে যাত্রা করার সংকল্প করেন তখন সকল আমীরকে পত্র মারফৎ আজনাদায়েন-এ সমবেত হওয়ার নির্দেশ প্রে রণ করেন। হযরত খালিদ এবং হযরত আবু উবায়দাও মানুষজনকে নিয়ে দামেস্ক অবরোধ পরিত্যাগ করে আজনাদায়েন-এঅবস্থানকারীদের উদ্দেশ্যে দ্রুততার সাথে রওয়ানা হন। হযরত আবু উবায়দা সেনাদলের পশ্চাৎভাগে ছিলেন। দামেস্কবাসী পশ্চাদ্ধাবন করে হযরত আবু উবায়দার নাগাল পেয়ে যায় এবং তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। তিনি ছিলেন দু'শ জনের সাথে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল নারী, শিশু, মালপত্র এবং বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম সম্বলিত কাফেলা। এক বর্ণনানুসারে, তাদের তত্ত্বাবধান ও সুরক্ষা প্র দানের উদ্দেশ্যে এক হাজার (বিভিন্ন বাহনে) আরোহী দলও ছিল। যাহোক, দামেস্কবাসী সংখ্যায় ছিল বিশাল । হযরত আবু উবায়দা তাদের সাথে তুমুল যুদ্ধ করেন। এ সংবাদ যখন আরোহী দলের সাথে সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে থাকা হযরত খালিদ (রা.)'র কাছে পৌঁছে তখন তিনি ফিরে আসেন এবং তার সাথে অন্যরাও ফিরে আসে। এরপর আরোহীরা রোমানদের ওপর আক্রমণ করে এবং তাদেরকে (হত্যা করে) লাশের ওপর লাশ ফেলতে ফেলতে তিন মাইল পর্যন্ত তাদেরকে পিছু হটিয়ে দেন, অবশেষে তারা আবার দামেস্কে গিয়ে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে আজনাদায়নে অবস্থানরত রোমান সেনাবাহিনী তাদের অন্য সেনাদলের কাছে পত্র প্রেরণ করে এবং তাদেরকেও আজনাদায়নে আসার নির্দেশ দেয়। রোমানদের এই সেনাদল হযরত শুরাহ্বীলের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে বুসরা অভিমুখে যাচ্ছিল। অতএব, সেই সৈন্যরাও আজনাদায়নে চলে আসে। একইভাবে হযরত খালিদের নির্দেশনা মোতাবেক গোটা ইসলামী সেনাদলও আজনাদায়েন-এ এসে সমবেত হয়।

(তারিখুল খামিস, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২২৮-২৩০) (মরদানে আরব, পৃ: ২১৪, ২১৬)

রোমান সেনাপতি মুসলমানদের অর্থ-সম্পদের প্রলোভন দেখিয়ে ফেরত পাঠাতে চায় কেননা তার ধারণা ছিল, ইরানীদের মতো এরাও ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন জাতি। লুটপাটের উদ্দেশ্যে নিজেদের দরিদ্র দেশ থেকে বেরিয়েছে। তারা বহু শতাব্দী ধরে অসভ্য, অজ্ঞ, নিঃস্ব, সুবিধা বঞ্চিত, যাযাবর আরব জাতির কাছ থেকে তারা কোনো মহান উদ্দেশ্যের ধারণাও করতে পারতো না। তাই হযরত খালিদ (রা.)-কে একটি প্রস্তাব দেয়, যদি তিনি ও তার সেনাদল ফিরে যায় তাহলে প্রত্যেক সৈন্যকে একটি পাগড়ী, এক জোড়া বস্ত্র, একটি করে স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে। সেনাপতিকে দশ জোড়া পোশাক এবং একশ' স্বর্ণমুদ্রা আর খলীফাকে একশ' জোড়া (পরিধেয়) বস্ত্র এবং এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে। সে বলে, এরা ডাকাত ও লুটতরাজকারী; এদেরকে এই পরিমাণ দিয়ে বিদায় করে দাও। হযরত খালিদ (রা.) এই প্রস্তাব শুনে তাচ্ছিল্যভরে তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং অত্যন্ত কড়া ভাষায় বলেন, হে রোমানরা! আমরা তোমাদের এই দানকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করছি। কেননা, অচিরেই তোমাদের অর্থ-সম্পদ, তোমাদের গোত্র ও তোমাদের জাতি-গোষ্ঠী আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

(আশারাহ মুবাশ্বেরা, প্রণেতা -বশীর সাজিদ, পৃ: ১৫৬-১৫৭)

উভয় সেনাদলই যখন নিকটবর্তী হয় তখন রোমানদের একজন নেতা একজন আরবকে ডেকে বলে, তুমি মুসলমানদের মধ্যে (গুপ্তচর হিসেবে) প্র বেশ করো। সেই আরব ব্যক্তি মুসলমান ছিল না। তাদের মাঝে এক দিবারাত্রি অবস্থান করো। এরপর আমার কাছে তাদের সংবাদ নিয়ে আসো। সে লোকজনের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে। আরবের লোক হওয়ার কারণে কেউ তাকে আগন্তু ক মনে করেনি। সে মুসলমানদের মাঝে এক দিন এবং এক রাত অবস্থান করে। এরপর যখন সে রোমান নেতার কাছে ফিরে আসে তখন সে জিজ্ঞেস করে, কি সংবাদ নিয়ে এলে? সে বলে, সংবাদ যদি জানতে চাও তাহলে শোনো! এরা ইবাদত করে রাত কাটায়, অর্থাৎ নিশিথে ইবাদতকারী আর দিনে অশ্বারোহী। নিজেদের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠার খাতিরে তাদের রাজপুত্রও যদি চুরি করে তবে তার হাত কেটে দেয়, আর যদি ব্যভিচার করে তাহলে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে।

রোমান নেতা তাকে বলে, তুমি আমাকে যা বলছ তা যদি সত্য হয় তাহলে ভূপৃষ্ঠে তাদের সাথে মোকাবিলা করার চেয়ে মাটির নীচে আশ্রয় নেওয়াই শ্রেয়! আমি চাই, আল্লাহ্ যেন আমার প্রতি অন্তত এতটুকু দয়া করেন যে, আমাকে এবং তাদেরকে নিজ নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেন। তাদের বিরুদ্ধে আমাকে যেন সাহায্য না করেন আর আমার বিরুদ্ধে তাদেরকেও যেন (সহযোগিতা) না করেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৭)

তারীখে তাবরীতে একথা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

যাহোক, সকাল বেলা লোকেরা পরস্পরের নিকটবর্তী হয়, তখন হযরত খালিদ(রা.) (তঁাবুর) বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং সেনাবাহিনীকে সুবিন্যস্ত করেন। হযরত খালিদ(রা.) লোকদেরকে জিহাদের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে করতে যেতে থাকেন এবং এক জায়গায় থেমে থাকতেন না। আর তিনি (রা.) মুসলমান নারীদের নির্দেশ দেন, তারা যেন দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকেন এবং যোদ্ধাদের পেছনে দণ্ডায়মান থাকেন, আল্লাহ্কে স্মরণ করেন এবং তাঁর কাছেই আহাজারি করতে থাকেন। আর মুসলমান পুরুষদের মধ্য হতে কেউ তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে (তথা পিছু হটলে) নিজ সন্তানদের তার দিকে তুলে ধরে যেন বলে যে, নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করো। হযরত খালিদ (রা.) প্রত্যেক দলের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেন আর বলতেন, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করো; আর আল্লাহ্র পথে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করেছে। আর নিজেদের গোড়ালিতে (ভর করে) ফিরে যেও না। এছাড়া তোমরা তোমাদের শত্রুকে দেখে ভীত-ত্রস্ত হয়ো না বরং সিংহের ন্যায় অগ্রসর হও যেন (তাদের) প্রভাব বা ভীতি কেটে যায় আর তোমরা হলে স্বাধীন সম্মানিত মানুষ। তোমাদেরকে পার্থিবতাও দেওয়া হয়েছে আর পারলৌকিক প্র তিদানও তোমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে নির্ধারিত বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তোমরা শত্রুর যে আধিক্য দেখছ তা যেন তোমাদেরকে ভীতিগ্রস্ত না করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর আযাব ও শাস্তি তাদের ওপর অবতীর্ণ করবেন। হযরত খালিদ লোকজনকে বলেন, আমি যখন আক্রমণ করবো তখন তোমরাও আক্রমণ করবে।

(তারিখুল খামিস, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩০-২৩১)

এরপর উভয় সেনাদলের মাঝে তুমুল যুদ্ধ হয়। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ মুসলমানদেরকে এভাবে উপদেশ দিয়ে অনুপ্রাণিত করেন

যে, হে লোকসকল! আল্লাহ্‌র সামনে নিজেদের মৃত্যুকে স্মরণ রাখবে আর যুদ্ধ থেকে পলায়ন করে জাহান্নামের অধিকারী হয়ো না। হে ধর্মের সুরক্ষাকারী, হে কুরআন পাঠ কারী! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো। যখন তুমুল যুদ্ধ হয় তখন রোমানরা পালিয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করে। এরা যখন নিজ অঞ্চলে পৌঁছে যায় তখন ওয়ারদান স্বজাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করে বলে, অবস্থা এমনই চলতে থাকলে এই দেশ ও ধন-সম্পদ তোমাদের হাতছাড়া যাবে। তাই ভালো হবে, এখনো সময় আছে নিজেদের মনের মরিচা ধুয়ে ফেল। আমাদের মনে কখনো ধারণাও আসে নি যে, এই রাখাল, ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন আরব ক্রীতদাসরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও খরা আমাদের দিকে ধাবিত করেছে আর এখন এরা এখানে এসে ফল-ফলাদি খেয়েছে, জবের স্থলে গমের রুটি পেয়েছে, সিরকার স্থলে মধু খাচ্ছে, ডুমুর, আঙ্গুর এবং উপাদেয় সব জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করছে। এরপর সে কতিপয় নেতার পরামর্শ চায় তখন জনৈক নেতা পরামর্শ দেয় যে, তোমরা যদি মুসলমানদের পরাজিত করতে চাও তাহলে তাদের আমীরকে ছলে বলে কৌশলে ডেকে এনে হত্যা করো, তাহলে অন্যরা সবাই পালিয়ে যাবে।

তোমরা প্রথমে গোত্রের দশজন সৈন্য প্রেরণ করো তারা যেন ওঁৎ পেতে বসে থাকে এরপর মুসলমানদের আমীরকে একাকি সংলাপ এবং আলোচনার জন্য আহ্বান করো; সে যখন আলোচনার উদ্দেশ্যে আসবে তখন ওৎ পেতে থাকা সৈন্যরা আক্রমণ করে তাকে হত্যা করবে।

অতএব, রোমানদের নেতা একজন বাকপটু ও বাগ্মী ব্যক্তিকে হযরত খালিদের কাছে প্রেরণ করে। দূত যখন মুসলমানদের কাছে এসে পৌঁছে তখন সে উচ্চস্বরে বলে, হে আরববাসী! তোমরা কি রক্তপাত ও হানাহানির ইতি টানবে না? আমরা সন্ধির একটি প্রস্তাব চিন্তা করেছি, তাই সমীচীন হবে তোমাদের নেতা যেন আমার সাথে আলোচনার জন্য সামনে এগিয়ে আসেন। হযরত খালিদ এগিয়ে গিয়ে তাকে বলেন, তুমি যে বার্তা নিয়ে এসেছ তা বর্ণনা করো তবে যা বলার সত্য বলবে। সে বলে, আমি এ উদ্দেশ্যে এখানে উপস্থিত হয়েছি যে, আমাদের আমীর রক্তপাত পছন্দ করেন না। এখন পর্যন্ত যারা মারা গেছে সেজন্য তিনি দুঃখিত। তাই তার মতামত হলো, তোমাদেরকে কিছু ধন-সম্পদ দিয়ে একটি সন্ধিচুক্তি করা যাতে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। আলোচনার সময় আগত দূতের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা এমনই ভীতি সঞ্চার করেন যে, সে নিজ পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার বিনিময়ে তার নেতার পুরো ষড়যন্ত্র হযরত খালিদের সামনে ফাঁস করে দেয়। ষড়যন্ত্রের যতটুকু সে জানতো অর্থাৎ কীভাবে অতর্কিতে হযরত খালিদের ওপর আক্রমণ করবে (সব বলে দেয়)। হযরত খালিদ (রা.) বলেন, তুমি যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করোতাহলে আমি তোমাকে ও তোমার পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। এরপর সে চলে যায় এবং তার নেতাকে গিয়ে বলে, হযরত খালিদ তার সাথে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছে। সে খুব খুশি হয় এবং আলোচনার জন্য যে জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছিল সেখানে তার দশজন সৈন্যকে একটি টিলার পেছনে লুকিয়ে রেখে ওৎ পেতে বসে থাকার নির্দেশ দেয়। হযরত খালিদকে যেহেতু ষড়যন্ত্রের কথা (পূর্বে ই) বলে দেওয়া হয়েছিল তাই তিনি এ বিষয়ে অবগত ছিলেন। অতএব, তিনি হযরত যিরারসহ দশজন মুসলমানকে সেই স্থানে প্রেরণ করেন যেখানে শত্রুরা ওৎ পেতে বসে ছিল। মুসলমানরা সেখানে পৌঁছে রোমান সৈন্যদের ধরে ফেলে এবং সবাইকে হত্যা করে তাদের স্থলে এরা বসে যায়। হযরত খালিদ (রা.) রোমানদের আমীরের সাথে আলোচনার জন্য চলে যান। উভয়পক্ষের সেনাদল পরস্পরের বিপরীতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রোমান নেতাও সেখানে পৌঁছে যায়। হযরত খালিদ তার সাথে আলোচনার সময় বলেন, তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করো তাহলে আমাদের ভাই হয়ে যাবে, নতুবা জিযিয়া বা কর দাও অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।

রোমান নেতার ওৎ পেতে থাকা সৈন্যদের ওপর আস্থা ছিল; তাই সে অকস্মাৎ হযরত খালিদ (রা.)'র ওপর তরবারি দিয়ে আক্রমণ করে বসে এবং তাঁর উভয় বাহু ধরে ফেলে। হযরত খালিদ (রা.)ও তার ওপর আক্রমণ করেন। রোমান নেতা তার লোকদের ডাক দিয়ে বলে তাড়াতাড়ি আস, আমি মুসলমানদের আমীরকে ধরে ফেলেছি। টিলার পেছনে সাহাবীরা এই আওয়াজ শুনতে পেয়ে তরবারি বের করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওয়ারদান প্রথমে মনে করেছিল, এরা আমার লোক। কিন্তু যখন হযরত যিরার (রা.)'র প্রতি দৃষ্টি পড়ে তখন সে হতভম্ব হয়ে যায়। এরপর হযরত যিরার (রা.) ও অন্যসৈন্যরা মিলে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে। রোমানরা যখন তাদের নেতার মৃত্যুসংবাদ পায় তখন তাদের মনোবল হারিয়ে যায়।

(ফুতুহাতে শাম, প্রণেতা- মহম্মদ ফযল ইউসুফ, পৃ: ৯৭-১০৪)

এরপর লোকজন পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। রোমানদের আরেকজন নেতা মুসলমানদের যুদ্ধের এই অবস্থা দেখে তার লোকদের বলে, আমার মাথা কাপড় দিয়ে বেঁধে দাও। তারা তাকে জিজ্ঞেস করে, কেন? সে বলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত অশুভ, আমি এদিন দেখতে চাই না। আমি পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কঠিন দিন আর দেখি নি। বর্ণনাকারী বলেন, যখন মুসলমানরা তার শিরচ্ছেদ করে তখন তা কাপড়ে জড়ানো ছিল। (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড,পৃ: ৩৪৭)

এই যুদ্ধে রোমানদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ ছিল।

(ফুতুহাতে বুলদান, লি ইমাম আবিল হাসান আল বালাযারি, পৃ:৭৪) (মুসলমানদের সংখ্যা ত্রিশ হাজার। (আল খলীফাতুল আওয়াল আবু বাকার সিদ্দীক শখসিয়্যত ও আসরুহু, পৃ: ৩১২) এবং আরেক বর্ণনানুযায়ী পঁয়ত্রিশ হাজার ছিল। (আশারায়ে মুবাশ্বেরা, প্রণেতা- বশীর সাজিদ, পৃ: ৮০৫)

এই যুদ্ধে তিন হাজার রোমান নিহত হয় এবং তাদের পরাজিত সৈন্যরা অন্যান্য শহরে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়।

(তারিখুল খামিস, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২৩১)

আজনাদায়েন বিজয়ের পর হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে একটি পত্র মারফৎ এই সুসংবাদ প্রদান করেন। এর বাক্যাবলী হলো, 'আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি আপনাকে সংবাদ দিচ্ছি যে, আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং তারা আমাদের বিপরীতে বিশাল সৈন্যবাহিনী আজনাদায়েন-এ সমবেত করে রেখেছিল। তারা তাদের ক্রুশগুলো উঁচু করে রেখেছিল এবং গ্রন্থাবলী ধারণ করে রেখেছিল এবং তারা আল্লাহ্'র শপথ করেছিল, আমাদেরকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত অথবা আমাদেরকে শহর থেকে বহিস্কার না করা পর্যন্ত তারা পলায়ন করবে না। আমরাও আল্লাহ্ তা'লার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা করে বের হই। এরপর আমরা তাদের ওপর কিছুটা বর্শা দিয়ে আক্রমণ করি, এরপর তরবারি বের করি এবং এর মাধ্যমে শত্রুর ওপর ততটুকু সময় পর্যন্ত আঘাত করতে থাকি, উট জবাই করে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করতে যতটুকু সময়ের প্রয়োজন হয়।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি তাঁর সাহায্য অবতীর্ণ করেন এবং স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন এবং কাফিরদেরকে পরাজিত করেন। আমরা প্রত্যেক প্রশস্ত পথে, প্রত্যেক উপত্যকায় এবং প্রতিটি নিম্নাঞ্চলে তাদেরকে হত্যা করেছি। স্বীয় ধর্মকে বিজয় দান করার, স্বীয় শত্রুকে লাঞ্ছিত করতে এবং স্বীয় বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কারণে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্'র জন্যই নিবেদিত। এই পত্র যখন হযরত আবু বকর (রা.)'র সামনে পাঠ করা হয় তখন তিনি (রা.) অন্তিম রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এই বিজয় তাঁকে আনন্দিত করে এবং তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্, সকল প্রশংসা আল্লাহ্'র যিনি মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছেন এবং এর মাধ্যমে আমার চোখকে শীতল করেছেন।

(তারিখুল খামিস, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২৩১-২৩২)

আজনাদায়েন এর যুদ্ধ সম্পর্কে এই সংশয়ও রয়েছে যে, এটি কবে হয়েছিল? কারও কারও মতে এটি হযরত উমর (রা.)'র যুগে হয়েছিল; এ সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ রয়েছে তাও উল্লেখ করছি। যেমন এই প্রশ্ন তোলা হয় যে, এটি কখন হয়েছে? এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। এক বর্ণনানুযায়ী এই যুদ্ধ ত্রয়োদশ হিজরীতে হযরত আবু বকর (রা.)'র মৃত্যুর ২৪ দিন অথবা ২০ দিন কিংবা ৩৪ দিন পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

(তারিখুল খামিস, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২৩২) (ফুতুহুল বুলদান লি ইমাম আবিল হাসান বালাযারি, পৃ:৭৪)

আবার কতক ঐতিহাসিকের মতে, এই যুদ্ধ হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে ১৫ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে।

(আল কামিলু ফিততারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬৬)

যাহোক, এটি আমাদের গবেষকদের গবেষণা ও ধারণা। আর এই ধারণাই সঠিক মনে হয়। বেশিরভাগ সম্ভাবনা এটিই যে, আজনাদায়েন নামক স্থানে দু'বার যুদ্ধ হয়ে থাকবে, প্রথমবার হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে আর দ্বিতীয়বার হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে। কেননা, কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থে উভয় ক্ষেত্রে ইসলামী সৈন্যদলের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। ত্রয়োদশ হিজরীতে সংঘটিত যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) আর ১৫ হিজরীতে সংঘটিত যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন হযরত আমর বিন আস। যাহোক, ওয়াল্লাহু আ'লাম অর্থাৎ আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

দামেস্ক বিজয় সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রয়েছে, তা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

যুক্তরাজ্যের ১৪তম শান্তি সম্মেলনে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ্‌র নামে যিনি অযাচিত অসীম দাতা, বার বার দয়াকারী।সম্মানিত অতিথিবর্গ, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু -- আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্‌র শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

প্রথমত আমি ওয়েস্টমিন্‌স্টারে বুধবারের সন্ত্রাসী হামলায় হতাহতদের সকলের প্রতি আমার গভীরতম শোক ও সমবেদনা জানাতে চাই। এ সংকটময় মুহূর্তে আমাদের চিন্তা ও দোয়া লন্ডনবাসীদের সাথে রয়েছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পক্ষ থেকে আমি এটি দ্ব্যর্থহীনভাবে স্পষ্ট করতে চাই যে, এ ধরনের সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে আমরা নিন্দা জানাই এবং এ বর্বর নৃশংসতার সকল হতাহতের প্রতি আমরা আমাদের হৃদয়-নিংড়ানো সহানুভূতি পেশ করি। বিশ্বের সকল প্রান্তে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শান্তির প্রসারের লক্ষ্যে কাজ করে, আর ইসলামের শিক্ষার অনুসরণে এ সকল নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে সরব হয়। এই বার্ষিক পীস সিম্পোজিয়াম (শান্তি সম্মেলন)-টিও এ প্রচেষ্টার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমি আমাদের সকল অতিথিকে আজ এ সন্ধ্যায় আমাদের সাথে যোগদানের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা বলেন যে, এ যুগে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাসত্বে তাঁকে খোদা তা'লা পাঠিয়েছেন যেন ইসলামী শিক্ষার দুই প্রধান উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয়। প্রথমটি হল মানবতাকে আল্লাহ্‌ তা'লার নিকটবর্তী করা আর দ্বিতীয়টি হল একে অপরের অধিকার আদায়ের প্রতি মানবজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এটি আমার বিশ্বাস যে এ দু'টি উদ্দেশ্যের পূর্ণতা হল সেই ভিত্তি প্রস্তর যা বিশ্বে প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বশর্ত।

মুসলিম হিসেবে আমরা সৌভাগ্যবান যে পবিত্র কুরআন আমাদেরকে অবহিত করেছে যে আমাদের সৃষ্টির মৌলিক উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌ তা'লার ইবাদত করা, সম্ভব হলে মসজিদে সমবেত হয়ে। অত্যন্ত আফসোসের বিষয় যে, এ সকল শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যের সাথে সম্পূর্ণ পরিপন্থিভাবে, কতক মুসলিম গ্রুপ বা ব্যক্তি তাদের মসজিদ ও মাদরাসাগুলোকে জঙ্গীবাদের কেন্দ্রে পরিণত করেছে, যেখানে তারা ঘৃণার প্রসার করে চলেছে আর তারা অপরকে অ-মুসলিম ও ইসলামের বিভিন্ন ফিরকার মুসলিমদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী আক্রমণ পরিচালনা করতে প্ররোচিত করছে। স্বভাবতই, এটি পশ্চিমা জগতে ব্যাপক ত্রাসের সঞ্চার করেছে আর এ ধারণার সৃষ্টি করেছে যে, মসজিদসমূহ সংঘাত ও বিশৃংখলার উৎস।

এর ফলস্বরূপ পশ্চিমা জগতে কতক দল ও গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এ দাবি উঠেছে যে, মসজিদসমূহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক, অথবা অন্তত, মুসলমানদের উপর কিছু বাঁধা-নিষেধ আরোপ করা হোক। উদাহরণস্বরূপ হিজাব নিষিদ্ধ করার জন্য দাবি রয়েছে বা মিনার ও অন্যান্য ইসলামী প্রতীকের ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। দুঃখজনকভাবে, কতিপয় মুসলিম অন্যদেরকে ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছে।

একজন মুসলমানের জন্য কেবল নামায পড়া আবশ্যক নয়, বরং তার জন্য এতীমদের দেখাশোনা করা ও দরিদ্রদের আহার করানোও আবশ্যক, নতুবা আমাদের নামায বৃথা যাবে। পবিত্র কুরআনে সূরা আল মা'উনের তিন, চার ও পাঁচ নম্বর আয়াতে এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে।

এ শিক্ষাগুলোর ভিত্তিতেই আল্লাহ্‌ তা'লার ফযলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ধর্ম-জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে বঞ্চিত মানুষের দুর্বিসহ যাতনা ও দুর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে নানা মানবসেবামূলক প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে। আমরা হাসপাতাল, স্কুল ও কলেজসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছি যেগুলো বিশ্বের কতক সর্বাধিক দারিদ্র্যকবলিত ও প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসেবা প্রদান করে আসছে।আমরা এ সকল কাজের জন্য কোন প্রশংসার প্রত্যাশী নই, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এ সকল মানুষকে তাদের নিজের দুই পায়ের উপর দাঁড়াতে সাহায্য করা, যেন তারা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে আর এর ফলস্বরূপ সন্তুষ্টচিত্তে মর্যাদা ও স্বাধীনতার সাথে জীবনযাপন করতে পারে। এভাবে বিক্ষুব্ধ বোধ করে চরমপন্থিতার দিকে ঝুঁকে পড়ার ঝুঁকিতে থাকার পরিবর্তে তারা তাদের দেশের দায়িত্বশীল ও বিশ্বস্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। যেখানে তারা ব্যক্তিগতভাবে উন্নতি করবে, সেখানে তারা তাদের জাতির উন্নয়নে অবদান রাখবে আর অন্যদেরকেও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে অনুপ্রাণিত করবে। অনুরূপভাবে, ইসলামী শিক্ষার ভিত্তিমূলে এ বিষয়টি রয়েছে যে, মুসলমানদের অবশ্যই সমাজের অন্য সকলের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে হবে এবং কখনো তাদের ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হওয়া যাবে না। এ সত্ত্বেও অনেকেই ইসলামকে সহিংসতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত করে থাকে, যদিও কোন কিছু সত্য থেকে এর চেয়ে বেশি দূরে হতে পারে না। সন্ত্রাসীরা যা-ই দাবি করুক না কেন, কোন অবস্থাতেই নিরীহ ব্যক্তিকে আক্রমণ বা হত্যা করাকে কখনোই বৈধতা দেওয়া হয় নি। মানব জীবনের অলংঘনীয়তাকে ইসলাম যেন খোদাই করে রেখেছে। পবিত্র কুরআনের সূরা আল মায়েদার ৩৩ আয়াতে বলা হয়েছে:

"যে কেউ এক ব্যক্তিকে হত্যা করলো... সে যেন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে হত্যা করলো, আর যে কেউ এক ব্যক্তিকে বাঁচালো, সে যেন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে বাঁচালো।"

এটি কতই না স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন এক বিবৃতি। কখনো কখনো কেউ কেউ প্রশ্ন করেন ইসলামের প্রাথমিক যুগে কেন যুদ্ধসমূহ হয়েছে? অনুরূপভাবে, তারা প্রশ্ন করেন ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতা কেন পরিচালিত হচ্ছে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমি সব সময় পবিত্র কুরআনের সূরা আল হাজ্জের দু'টি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকি, যেখানে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের প্রথম আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সূরা আল হাজ্জের ৪০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন: "যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হল, কারণ তাদের উপর যুলুম করা হচ্ছে - আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাদের সাহায্য করার বিষয়ে ক্ষমতাবান।"এর পরবর্তী আয়াতে পবিত্র কুরআনে সেই কারণসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে যার জন্য মহানবী (সা.)-কে যুদ্ধে রত হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। সূরা আল হাজ্জের ৪১ আয়াতে বলা হয়েছে:"যাদেরকে তাদের ঘর বাড়ি হতে শুধুমাত্র এ কারণে বহিষ্কার করা হয়েছে যে তারা বলে, 'আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতিপালক' - আর যদি আল্লাহ্‌ এদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে সাধু-সন্ন্যাসীদের মঠ, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ, যেখানে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করানো হয়, ধ্বংস করে দেওয়া হত। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাদের সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সাহায্য করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ অতিশয় শক্তিমান, মহা পরাক্রমশালী।"

এ আয়াতগুলো কি প্রমাণ করে? নিশ্চয়ই এতে মুসলমানদেরকে অন্যের উপর নিষ্ঠুর আচরণের বা অন্যের রক্ত নিয়ে হোলি খেলার অনুমতি প্রদান করা হয় নি। বরং এগুলো সকল মুসলমানের উপর এ দায়িত্ব স্থাপন করে যেন তারা অন্যান্য ধর্মের সুরক্ষা করে ও কোন প্রকার জবরদস্তি বা চাপ থেকে মুক্ত হয়ে সকল মানুষের স্বাধীনভাবে নিজ বিশ্বাসের অধিকার নিশ্চিত করে।

সুতরাং, ইসলাম হল সেই ধর্ম যা ধর্মের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার সার্বজনীন নীতিসমূহকে চিরন্তনভাবে ধারণ করে রেখেছে।অতএব, আজ যদি কিছু তথাকথিত মুসলিম গোষ্ঠী বা দল থেকে থাকে যারা নরহত্যা করে চলেছে, তবে একে কেবল সবচেয়ে কঠিনতম ভাষায় ধিক্কার জানানোই সম্ভব। তাদের বর্বর কর্মকাণ্ড ইসলাম যা কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এটি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে এসব লোকেরা যে ধর্মবিশ্বাস অনুসরণের দাবি করে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

তা সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই।

উদাহরণস্বরূপ, ব্রাসেল্‌স ও প্যারিস আক্রমণে সম্পৃক্ত একজন সন্ত্রাসীর আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী মি. স্‌ভেন মেরী সম্প্রতি একটি ফরাসী সংবাদপত্রে একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। নিশ্চিতভাবেই যখন তাকে (সেই সন্ত্রাসীকে) প্রশ্ন করা হয় তিনি কোন দিন কুরআন পড়েছেন কিনা, তার মক্কেলের সহজ স্বীকারোক্তি ছিল যে, তিনি কোন দিনই কুরআন পড়েন নি, কেবল অনলাইন একটি তফসীর পড়েছেন। তদুপরি মার্চ ২০১৬ তে রয়েল ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্‌স প্রকাশিত এক গবেষণা পত্রে এ উপসংহারই টানা হয়, যে সকল সন্ত্রাসী নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে, তাদের এর শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান সামান্য অথবা শূন্য। যে সকল মুসলিম যুবকদের উগ্রপন্থিতার মন্ত্র পড়ানো হয়েছে এবং যারা পাশ্চাত্য জগতে আক্রমণসমূহ পরিচালনা করেছে তাদের চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে:"তাদের পূর্বসূরীদের তুলনায়, আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে তাদের ধারণা যেমন তুলনামূলকভাবে সীমিত, তেমনি ধর্মের দর্শন সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃসন্দেহে অগভীর ও ভাসা-ভাসা।... তাদের পূর্বসূরীদের চরমপন্থিতা ও সন্ত্রাসের দিকে যাত্রার গোড়াতে অনেক ক্ষেত্রেই অন্যায়-অবিচারের বিষয় ছিল। বর্তমানে এর স্থলে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত জীবনের অস্থিরতা ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যসমূহ তাদের এ পথে যাত্রা মুখ্য চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে।" উপরন্তু, ওয়াশিংটন পোস্টে উদ্ধৃত এক প্রবন্ধে, বেলজিয়ামের সন্ত্রাস প্রতিরোধকারী সংস্থার এক কর্মকর্তা এ্যালেইন গ্রিগনার্ড বলেন:"সমাজ থেকে তাদের বিদ্রোহ প্রথমে ছোট ছোট অপরাধ ও দস্যুপনা হিসেবে প্রকাশ পায়। তাদের অনেকেই বস্তুত রাস্তার কোন মাস্তান দলের সদস্য। ইসলামিক স্টেট-এর অভ্যুদয় তাদের সামনে ইসলামের এমন এক ধারাকে একে দেয় যা তাদের উচ্ছৃংখল কর্ম-পদ্ধতিকে বৈধতা দান করে।"

সুতরাং অ-মুসলিম বিশেষজ্ঞগণও স্বীকার করেন যে সন্ত্রাসীরা ইসলামের এক "নতুন ধারা" প্রতিষ্ঠা করেছে, যাকে ইসলামের শিক্ষাসমূহের এক ঘৃণ্য বিকৃতি হিসেবেই কেবল বর্ণনা করা যায়। যারা এ নতুন ধারাকে অবলম্বন করেছে, আর নির্দয়ভাবে নিরীহ মানুষের হত্যা, অঙ্গহানি ও ধর্ষণ করছে, পবিত্র কুরআনের ভাষায় তারা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যার দায়ে দোষী।অপরপক্ষে, এটিও স্পষ্ট যে অমুসলিমদের মাঝে এমন কতক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আছে যারা এ বিভেদ ও সহিংসতার আগুনে বাতাস দিচ্ছে এবং যারা ইসলামের শিক্ষাকে অন্যায়ভাবে অপদস্থ ও অবমূল্যায়ন করাকে নিজেদের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, গত সপ্তাহেই ফরেন পলিসি শীর্ষক সাময়িকীতে প্রকাশিত এক কলানে সাংবাদিক বেথানি এ্যালেন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এক আর্থিক মদদপুষ্ট ও অত্যাধুনিক নেটওয়ার্কের কথা লেখেন যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল ইসলামের ভীতিকে উসকে দেয় এবং ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার বিস্তারের সকল প্রচেষ্টাকে রোধ করা।

ফরেন পলিসি-র প্রবন্ধের বলা হয়েছে: "একটি আর্থিক মদদপুষ্ট নেটওয়ার্ক আমেরিকার মুসলমানদের কাছ থেকে তাদের মত প্রকাশের অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিষয়ে সচেষ্ট আছে আর তারা আতঙ্কের রাজনীতিতেই কেবল ইন্ধন যোগাচ্ছে... আমেরিকার চরম ডানপন্থী, মুসলিম বিদ্বেষী চক্র ইসলামের হুবহু সেই বিকৃত ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করেছে, যা ইসলামিক স্টেট (আইসিস) প্রচার করে থাকে।"

লেখক আরো লেখেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে শান্তিপ্রিয় মুসলমানেরা শিকার হচ্ছে: "... ইসলামভীতির প্রসারকারী এক ক্রমাগত শক্তিবর্ধিষ্ণু চক্রের যা ভারসাম্যপূর্ণ ও উন্মুক্ত সংলাপের সকল সুযোগকে সংকীর্ণ করে, এবং সেই সকল মুসলমানকে নিষ্ক্রীয় করে ফেলে যারা ইসলামের মূলধারার শান্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাসমূহ প্রচারের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।"

তিনি লেখেন:"যুক্তরাষ্ট্রে মত প্রকাশ ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতা শক্তিশালীভাবে সংরক্ষিত ... কিন্তু, একটি পরিকল্পিত নেটওয়ার্ক এখন মুসলিমদের সেই অধিকার হরণের এবং ইসলামকে একটি ধর্মের পরিবর্তে একটি বিপজ্জনক রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টায় রত -- আর এর সাথে দ্বিমত পোষণকারী যেকোন মুসলমানের মুখ বন্ধ করে দিতে ও তাদের অবমূল্যায়িত করতে তারা তৎপর।"এ প্রবন্ধটিতে যুক্তরাষ্ট্রে এক শান্তিপ্রিয় মুসলমানের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাতে তুলে ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা প্রদানের পর পরই, একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী তার পিছনে লেগে যায় এবং তাকে খুন, দাসপ্রথা ও ধর্ষণের পক্ষের মানুষ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে। তার পরিবারকে হত্যা ও ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়। তার তৎক্ষণাৎ পদচ্যুতি দাবি করে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কাজ করতেন সেটিকে ইমেইলে প্লাবিত করে দেওয়া হয়। অতএব, এমন ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে জনমতকে প্রভাবিত করার এবং এর প্রকৃত শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাতে না দেওয়া একটি সুসংগঠিত প্রচেষ্টা চলমান আছে। তার নিজ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে লেখক এ উপসংহারে উপনীত হন যে: "এ প্রক্রিয়ায়, তারা ইসলামকে সেই ব্যবহারিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে যা খ্রিস্টধর্ম উপভোগ করছে, আর তারা ঠিক সেই মানুষগুলোর বাক-স্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছে যারা আধুনিক আমেরিকান জীবনধারার সাথে ইসলামের সমন্বয় সাধনের জন্য সবচেয়ে ভাল অবস্থানে আছেন। আর সেটিই তো আসল উদ্দেশ্য হতে পারে।"

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা প্রায়ই রাজনীতিবিদদের ও নেতৃবর্গের মুখে অযথা উত্তেজনাকর বিবৃতিসমূহ শুনে থাকি যেগুলো সত্যের সাথে নয়, বরং তাদের নিজ রাজনৈতিক স্বার্থপ্রসূত। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান নতুন মার্কিন প্রশাসনের এক মন্ত্রীসভা সদস্য ড. বেন কারসন গত বছর রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী থাকাকালীন এক বক্তৃতায় ইসলামকে একটি ধর্ম বলে অভিহিত না করে একটি

"জীবন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি" হিসেবে উল্লেখ করেন।

উপরন্তু ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা (সা.)-এর সম্পর্কে ড. কারসন বলেন: "আমার পরামর্শ এই যে, সকলেরই উচিত কয়েকটি ঘন্টা ব্যয় করে ইসলাম সম্পর্কে একটু পড়াশোনা করে নেওয়া। পড়ুন মুহাম্মদ সম্পর্কে। পড়ুন কিভাবে মক্কায় তার জীবনের সূচনা। পড়ুন মক্কার লোকেরা তাকে কি চোখে দেখতো- খুব একটা মূল্য দিতো না... কিভাবে তার চাচা প্রভাবশালী ছিলেন এবং তাকে রক্ষাকরতেন। যখন তার চাচার মৃত্যু হল, তাকে পালাতে হল। তিনি উত্তরে মদীনায় গেলেন ... সেখানেই তিনি তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করলেন, আর এমন সকলকে হত্যা করতে শুরু করলেন যারা সেই বিশ্বাসের অনুসারী ছিল না যা তাদের বিশ্বাস ছিল।"

আমি ড. কারসনের সঙ্গে একমত, কেবল এ পর্যন্ত যে, আমিও এ পরামর্শ দিব যে, মানুষ যেন ইসলামের মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্য নিয়ে পড়াশোনা করতে সময় ব্যয় করেন। যদি তারা নিরপেক্ষ বর্ণনাগুলো অনুসরণ করেন, তারা নিজেরাই দেখতে পারবেন যে, মহানবী (সা.) কোন দিনই অমুসলিমদের কোন "হত্যাযজ্ঞ"-তে জড়িত ছিলেন না আর এমন দাবিসমূহ ইতিহাসের ধৃষ্টতাপূর্ণ অস্বীকৃতি মাত্র। অথচ প্রকৃত সত্য এই যে, বহু বছরের বিরামহীন ও কঠোর নিপীড়নের ফলস্বরূপ, তিনি ও তাঁর অনুসারীরাই তাঁর মাতৃভূমি মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যেখানে তারা স্থানীয় ইহুদী ও অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করেন। কিন্তু মক্কার অবিশ্বাসীরা মুসলমানদের শান্তিতে বাস করতে না দিয়ে, আক্রমণাত্মকভাবে মদীনা পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে ইসলামকে চিরতরে নির্মূল করার অভিপ্রায়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এই ছিল ইসলামের ইতিহাসের সেই ক্রান্তি লগ্ন যখন আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দিলেন। এ অনুমতি এ জন্য দেওয়া হয়েছিল, যেভাবে পূর্বে বর্ণিত কুরআনের আয়াতগুলো নিশ্চিত করে, এ উদ্দেশ্যে যে বিশ্বাসের স্বাধীনতার সার্বজনীন নীতি যেন প্রতিষ্ঠিত হয়।সুতরাং, এ অভিযোগ যে মহানবী (সা.) এক সহিংস নেতা বা যুদ্ধবাজ ব্যক্তি ছিলেন এটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের এক অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা আর এরূপ মিথ্যা দাবি কেবল বিশ্ব জুড়ে লক্ষ-কোটি শান্তিপ্রিয় মুসলমানের হৃদয়কে কেবল ব্যথিতই করতে পারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, নিজ সত্তার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে ইসলামের মহানবী (সা.) সর্বদা শান্তি ও সমঝোতাই কামনা করেছেন।এ বিষয়ে আমার মুখের কথা আপনাদের বিশ্বাস করতে হবে এমন নয়; বরং বিংশ শতকের একজন বিশিষ্ট লেখিকা রুথ ক্র্যানস্টন তাঁর ১৯৪৯ সালের বই ওয়ার্ল্ড ফেইথ (বিশ্ব ধর্ম)-এ কী লিখেছেন তা শুনুন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর চাপিয়ে দেয়া আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্রের ব্যবহারের তুলনা করতে গিয়ে তিনি লেখেন: "মুহাম্মদ কখনো সংঘাত ও রক্তপাতের সূচনা করেন নি। যতগুলো যুদ্ধ তিনি তিনি লড়েছেন সেগুলো ছিল প্রতিক্রিয়ামূলক। টিকে থাকার জন্য আত্মরক্ষামূলক তিনি লড়েছিলেন।... আর তিনি সমসাময়িক অস্ত্র দিয়ে সমকালীন পদ্ধতিতে যুদ্ধ করেছিলেন।...

নিশ্চিতভাবে ১৪ কোটি মানুষের এমন কোন খ্রিস্টান রাষ্ট্র

যেটি একটিমাত্র বোমা দিয়ে ১,২০,০০০ অসহায় বেসামরিক মানুষকে হত্যা করেছে, এমন এক নেতার বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করতে পারে না যিনি বড় জোর পাঁচ কি ছয়শত মানুষকে হত্যা করেছেন।" সৌভাগ্যের কথা যে, এমন এক পরিবেশে যেখানে ইসলামকে চরমপন্থিতা ও সন্ত্রাসের এক ধর্ম হিসেবে তিরস্কার করাটাই প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন কতক অমুসলিম সাংবাদিক ও পর্যালোচক রয়েছেন যারা সততা ও ন্যায়ের সাথে লিখে থাকেন। এ জন্য আমি তাদেরকে, মিথ্যা ও অবিচারের সর্ববিস্তারী স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কেটে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাধুবাদ জানাই। আর আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিও আমি বিশেষ সাধুবাদ ব্যক্ত করতে চাই যিনি তাঁর কতক বক্তৃতায় পবিত্র কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতিমূলে ইসলামের শিক্ষার উপর উত্থাপিত আপত্তিসমূহের খণ্ডন করেছেন।এ প্রসঙ্গে আমি ফরেন পলিসি সাময়িকীতে জুলিয়া ইওফে রচিত একটি প্রবন্ধেরও প্রশংসা করতে চাই যেখানে তিনি ইসলামসহ বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাসের পর্যালোচনা করেছেন। তিনি উপসংহার টেনেছেন এ কথা বলে যে: "কোন ধর্মই অন্তর্নিহিতভাবে সহিংস নয়। কোন ধর্মই অন্তর্নিহিতভাবে শান্তিপূর্ণ নয়। ধর্ম, তা যে কোন ধর্মই হোক না কেন, ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, আর প্রায়শই এই ব্যাখ্যাতেই আমরা সৌন্দর্য্য বা কদর্য দেখতে পাই।"

আমি এ পক্ষপাতহীন উপসংহারকে সাধুবাদ জানাই। আমরা যখন এ অনিশ্চয়তাপূর্ণ ও সঙ্গীন সময় অতিক্রম করার চেষ্টা করছি, এটি আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে একে অপরকে দোষারোপ করে কোন লাভ হবে বরং তা কেবল বিভেদ ও শত্রুতাকে বাড়িয়ে দিতে পারে। এর পরিবর্তে, সময়ের দাবি এই যে, আমরা যেন সেই সকল দেয়ালকে ভেঙে ফেলি যেগুলো আমাদেরকে বিভক্ত করে রেখেছে। এমন দেয়াল নির্মাণের পরিবর্তে যা আমাদেরকে একে অপর থেকে দূরে রাখবে, আমাদের উচিত এমন সেতু বন্ধন রচনা করা যা আমাদেরকে পরস্পরের কাছে নিয়ে আসবে।দুর্ভাগ্যজনকভাবে, একটি দিনও এমন যায় না যখন নতুন সহিংসতা ও সন্ত্রাসী হামলার সংবাদ আমাদের কাছে আসে না। সন্দেহাতীতভাবে, বিশ্ব মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য ক্রমাগত অধিকতর বিপজ্জনক এক স্থানে পরিণত হচ্ছে। তাই, আমাদের অবশ্যই সকল প্রকার নিপীড়ন ও ঘৃণার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হতে হবে, আর আমাদের সর্বশক্তি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে নিয়োজিত করতে হবে। যদি আমরা প্রকৃতপক্ষেই শান্তি চাই তবে বিশ্বের রাজনীতিবিদ, নেতৃবর্গ, প্রচারমাধ্যম ও দলগুলোকে অবশ্যই প্রজ্ঞা ও উদারতার সাথে আচরণ করতে হবে।

এমন অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে যেখানে এ ধারণা পেশ করা হয়েছে যে, পাশ্চাত্য জগতে তাদের বিশ্বাসের প্রতি আক্রমণ ও বিদ্রুপের কারণে তাদের মধ্যে ক্ষোভের অনুভূতি সঞ্চারিত হওয়ার কারণেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান যুবক চরমপন্থিতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কোন ভাবেই এটি তাদেরকে আচরণকে যথার্থতা বা দায়মুক্তি দেয় না আর তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য অবশ্যই দোষী ও দণ্ড প্রাপ্য। তথাপি, সাধারণ জ্ঞান আমাদের এ শিক্ষা দেয় যে, আমাদেরও আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়া উচিত না। বরং আমাদের উচিত পারস্পরিক সমঝোতার সন্ধান করা, অন্যের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা এবং তাদের সাথে নিজেদের মিলগুলোর সন্ধানে থাকা।

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ ও মূল্যবান এক মূলনীতি ৩:৬৫ আয়াতে পেশ করেছে, যেখানে বলা হয়েছে:

"তোমরা এমন এমন এক কথায় আস, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমান"এখানে কুরআন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এক স্বর্ণালী নীতি পেশ করেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, মানুষের উচিত সে সব বিষয়ের উপর মনোনিবেশ করা যা তাদেরকে একতাবদ্ধ করে। বড় বড় ধর্মের ক্ষেত্রে একতা আনয়নকারী সত্তা খোদা তা'লা স্বয়ং, কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে একজন ধার্মিক মানুষের সাথে একজন ধর্মহীন মানুষের কোনই মিল নেই। তাই, কুরআন আমাদের শিখিয়েছে কিভাবে এক শান্তিপূর্ণ, বহুজাতিক সমাজ গড়ে তুলতে হবে, যেখানে সকল ধর্ম ও মতের মানুষ সহাবস্থান করতে পারবে। এর মূল উপাদান হল পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা। অনুরূপভাবে আরেক স্থানে কুরআন নির্দেশ দিয়েছে যে মুসলমানগণের অন্যের প্রতিমা বা উপাস্যদের বিরুদ্ধে কথা বলা উচিত না, কেননা প্রতিক্রিয়ায় তারা আল্লাহ্‌কে মন্দ ভাষায় উল্লেখ করবে আর অন্তহীন ক্ষোভের এক চক্রের সূচনা হয়ে যাবে। যেমনটি আপনারা অবহিত আছেন, আজকের সন্ধ্যার এ অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু

"বৈশ্বিক সংকটসমূহ ও ন্যায়ের আবশ্যকতা"। আর আমি বহু বছর ধরে বলে আসছি যে, আমাদের সমাজের পরতে পরতে ন্যায়ের অভাব ছড়িয়ে পড়েছে এবং এটিই নৈরাজ্যকে ইন্ধন যুগিয়েছে। জাতিসংঘেও ন্যায়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়, এমন পর্যায়ে যে, জাতিসংঘের সাথে নিকট-সম্পর্ক যারা রাখেন তারাও খোলাখুলি এর দুর্বলতাসমূহ ও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার এর মূল লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতার সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে জাতিসংঘের সাবেক সহকারী মহাসচিব এ্যান্থনি ব্যানবারি লেখেন:

"জাতিসংঘকে আমি ভালবাসি, কিন্তু এটি ব্যর্থ হচ্ছে। এখানে আমলাতন্ত্র মাত্রাতিরিক্ত আর ফলাফল অতি সামান্য। জাতিসংঘের মূল্যবোধ ও লক্ষ্যকে অনুসরণ বা কার্যক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা না করে, অনেক বেশি সিদ্ধান্ত কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নেওয়া হয় ... জাতিসংঘকে এগিয়ে যেতে ও উন্নতি করতে হলে এর আমূল পরিবর্তন আনতে হবে আর তাই উচিত হবে বহিরাগত কোন প্যানেল যেন এ সিস্টেমটির পর্যালোচনা করে এবং পরিবর্তনসমূহের সুপারিশ করে।" অনুরূপভাবে, সম্প্রতি কতক সরকার অন্যায় ও বিচক্ষণতাবর্জিত বৈদেশিক নীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যেগুলো বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতার উপর এক অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। একজন সুপরিচিত কলামিস্ট, পল ক্রুগম্যান, সাম্প্রতিককালে নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সে ২০০৩ সালের ইরাক যুদ্ধ সম্পর্কে লিখেছে:

"ইরাকের যুদ্ধ একটি নিষ্পাপ ভুল ছিল না, এমন এক উদ্যোগ যা এমন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছিল যা পরবর্তীতে ভুল সাব্যস্ত হয়েছে ... জনসমক্ষে উক্ত আক্রমণের স্বপক্ষে যতগুলো যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো বাহানা ছাড়া কিছুই ছিল না, তাও আবার এমন বাহানা যা ছিল সর্বৈব মিথ্যা রটনা।"

যে কারণে আমি এ উদাহরণগুলো পেশ করেছি তা উদ্দেশ্য এটি তুলে ধরা যে, আজ এটি অন্যায্য দাবি হবে যদি বলা হয় যে, বিশ্বে আজ দৃশ্যমান ক্রমবর্ধিষ্ণু সংঘাতের জন্য কেবল মুসলমানেরাই দায়ী। যদিও এটি অনস্বীকার্য যে কতক মুসলিম দেশ আজকের যুদ্ধসমূহ ও নৃশংসতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে, তথাপি এটিও বলা যায় না যে, বাকি বিশ্ব একতাবদ্ধ এবং বিশৃংখলা থেকে মুক্ত।উদাহরণস্বরূপ, বারংবার এমন প্রতিবেদনসমূহ বা বিবৃতিগুচ্ছ সামনে এসেছে যেগুলো যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার দিকে এমনকি তাদের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনার দিকে ইশারা করে। বস্তুত সম্প্রতি ব্যাপকভাবে এ সংবাদ প্রচারিত হয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের একজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা বলেছেন যে, এতে "কোন সন্দেহ নাই যে আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে একটি যুক্তরাষ্ট্র-চীন যুদ্ধ সংঘটিত হবে।

অনুরূপভাবে জানুয়ারিতে, সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট পত্রিকা একজন সিনিয়র চীনা সামরিক কর্মকর্তার একটি উদ্ধৃতি প্রকাশিত হয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্র-চীন যুদ্ধ এখন আর কেবল একটি স্লোগান নয়, বরং তা ক্রমশ একটি "ব্যবহারিক বাস্তবতা"-তে পরিণত হচ্ছে।অনুরূপভাবে, রাশিয়া ও পাশ্চাত্যের দেশগুলোর মধ্যে টানাপোড়েন সর্বদাই ছাই চাপা আগুনের ন্যায় জ্বলছে আর যেকোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হওয়ার হুমকি দিচ্ছে। বস্তুত উত্তেজনা যখন বেড়েই চলছিল, জার্মানীর সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী ফ্রাঙ্ক-ওয়াল্টার স্টাইনমাইয়ার, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রুশ সীমান্তে নেটো-র সামরিক মহড়ার সমালোচনা করেন। গত জুনে এ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন:

"যে একটি কাজ অন্তত আমাদের করা উচিত না তা হল, উচ্চকিত শক্তি-প্রদর্শন ও যুদ্ধংদেহী আচরণের মাধ্যমে পরিস্থিতিকে আরো উত্তেজিত করে তোলা। ... কেউ যদি মনে করেন যে, (নেটো) জোটের পূর্ব সীমান্ত দিয়ে সাজোয়াঁ যানের একটি প্রতীকী মহড়া চালালেই নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে, তিনি ভুল করছেন। আমাদের জন্য সদুপদেশ এটাই হবে যে পুরনো এক সংঘাতকে এ মুহূর্তে নবায়ন করার বাহানা তাদের হাতে আমাদের তুলে দেওয়া উচিত না।"

আমি এ সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতির সাথে একম যে, রাষ্ট্রসমূহে একে অপরকে উস্‌কে দেওয়া উচিত না, বা তাদের আধিপত্য বিস্তারের। যাহোক, আমি কয়েকটি এমন প্রতিবেদন উদ্ধৃত করেছি যেগুলোতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে আমরা আরো যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় উভয় পর্যায়ে আমরা মেরুকরণ ও একে অপরের প্রতি মনোভাবকে কঠোরতর হতে দেখছি। একে অপরকে দোষারোপ করা ও দায়ভার চাপানোর পরিবর্তে, এখন সময় সমাধান খোঁজার। আমার মতে একটি সমাধান আমাদের হাতে প্রস্তুত আছে যার কার্যকারিতা তাৎক্ষণিক হতে পারে এবং যা বিশ্বের এ ক্ষতকে সারিয়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 29 Sep, 2022 Issue No. 39

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

করবে। এখানে আমি আন্তর্জাতিক অস্ত্র বাণিজ্যের কথা বলছি, যা আমার মতে সংকোচন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

আমরা সবাই জানি যে, পশ্চিমা দেশগুলো তাদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য বিদেশে অস্ত্র বিক্রী করছে এবং এতে ঐ সকল দেশও অন্তর্ভুক্ত যারা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত। উদাহরণস্বরূপ, মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে এটি ব্যাপকভাবে সংবাদে এসেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রশাসন সৌদি আরবের নিকট অত্যাধুনিক প্রিসিশন-গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি বিক্রয়ের জন্য নতুন অস্ত্র চুক্তি স্বাক্ষর করতে চলেছে। উপরন্তু গত বছর প্রকাশিত জাতিসংঘের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, অস্ত্র বিক্রয়ের সময়

সর্বজনীন আইনের অনুসরণের কোন পরোয়া করা হয় না। এতে পাওয়া গেছে যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কোম্পানি, ব্যক্তি ও দেশ দীর্ঘদিন ধরেই লিবিয়ার উপর আন্তর্জাতিক অস্ত্র অবরোধ লঙ্ঘন করে সেখানকার বিভিন্ন পক্ষকে অস্ত্র সরবরাহ করে আসছে।

আর যেখানে সীমিতভাবে কিছু আইন রয়েছে, সেগুলোও যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। যেখানে প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, মানবতার কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সেখানে দুঃখজনক সত্য হল বাণিজ্যিক স্বার্থ ও সম্পদের লিপ্সা বিনা ব্যতিক্রমে এ সকল উদ্বেগের উপর অগ্রাধিকার লাভ করে। এ সংকীর্ণ স্বার্থপরতার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে সি.এন.এন.-এর একজন বহুলপরিচিত সঞ্চালক সম্প্রতি বলেন, অস্ত্র বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে মার্কিন প্রতিরক্ষা কোম্পানিগুলোতে লোকবল হ্রাস বা চাকুরীচ্যুতি ঘটতে পারে। সরাসরি সম্প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারের সময় তিনি বলেন:"অনেক চাকুরী এখানে হুমকির মুখে পড়বে। এটা নিশ্চিত যে, যদি এ সকল প্রতিরক্ষা কন্ট্রাক্টরদের অনেকেই যুদ্ধ বিমান ও অন্যান্য অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সৌদি আরবকে বিক্রী করা বন্ধ করে দেয় তবে এখানে যুক্তরাষ্ট্রে উল্লেখযোগ্য বেকারত্ব ও লোকসানের ঘটনা ঘটবে।"তদুপরি কখনো কখনো এ যুক্তি দেখানো হয় যে, অস্ত্র বিক্রী প্রকৃতপক্ষে শান্তিকে "উৎসাহিত" করতে পারে, কেননা অস্ত্র "ডিটারেন্ট" (অপর পক্ষকে সংঘাত সূচনা করতে নিরুৎসাহিতকারী) হিসেবে কাজ করতে পারে। আমার মতে, এ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বরং তা কেবল অত্যাধিক ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র আরো অধিক উৎপাদন ও বাণিজ্যকেই উৎসাহিত করে।

নিশ্চিতভাবে, এ ধরনের যুক্তি প্রদর্শনই বিশ্বকে এক অন্তহীন অস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত করেছে। মানবজাতির কল্যাণার্থে সরকারগুলোর এ শংকাকে উপেক্ষা করা উচিত যে, অস্ত্র বাণিজ্য সংকুচিত করলে তাদের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। বরং তাদের ভাবা মুসলিম দেশগুলোতে, এমনকি দায়েশের ন্যায় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর হাতে যে অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে তার অধিকাংশই পাশ্চাত্যে অথবা পূর্ব ইউরোপে উৎপাদিত আর তাই এখনই সময় এমনভাবে যথোপযুক্ত অবরোধ আরোপ করার, এবং সেটিকে কার্যকরভাবে বলবৎ করার। যদি এই একটি পদক্ষেপও নেওয়া হয়, আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে অল্প সময়কালের মধ্যেই এর অত্যন্ত অর্থবহ ফল বয়ে আনবে। অন্যথায় যা ঘটবে তা কল্পনা করা দুষ্কর।

আমার বিষয়টি আরো ভেঙে বলার প্রয়োজন নেই, কেননা যে প্রবন্ধগুলো আমি উদ্ধৃত করেছি সেগুলো নিজেরাই বিষয়টি স্পষ্ট করে এবং আরেকটি বিশাল আকারের যুদ্ধের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কোন দেশ বা গোষ্ঠীর এ ভ্রান্তির মধ্যে থাকা উচিত না যে তারা নিরাপদ, কেননা যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তখন সেগুলো দ্রুত এবং প্রায়শ অপ্রত্যাশিত দিকে মোড় নেয়।

যদি আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ফিরে তাকাই, এমন জাতিসমূহ ছিল যেগুলো যুদ্ধে অংশ না নেওয়ার বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জোট ও ব্লকগুলোতে যখন রদবদল হতে থাকে, তারা এতে জড়িয়ে পড়ে। আজ বেশ কয়েকটি দেশের হাতে নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র রয়েছে, আর যদি কেবল এমন একটি অস্ত্রও কোন দিন ব্যবহৃত হয়, এর পরিণতি হবে অকল্পনীয়, আর আমরা এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পরও যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মসমূহের জন্য সমৃদ্ধির এক উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার পরিবর্তে তাদের জন্য কেবল দুঃখ-যাতনা রেখে যাওয়ার অপরাধে আমরা দোষী হয়ে থাকবো। বিশ্বের জন্য আমাদের অবদান হবে এক প্রজন্ম প্রতিবন্ধী শিশু, যাদের জন্মই হবে বিকলাঙ্গ অথবা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হিসেবে। কে জানে তাদের দেখাশোনা ও লালন-পালনের জন্য তাদের পিতা-মাতাও বেঁচে থাকবেন কিনা?

সুতরাং আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে, যদি আমরা যে কোন মূল্যে আমাদের নিজ স্বার্থ উদ্ধারে রত থাকি, তবে অন্যদের অধিকার হরণ করা হবে আর এর পরিণাম কেবলই সংঘাত, যুদ্ধ ও দুর্দশা। আমরা যে নীতির উপর দণ্ডায়মান তার বিষয়ে আমাদের পুনরায় চিন্তা ও উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য আমাদেরকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে।

যেভাবে আমি শুরুতেই বলেছি, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা আবির্ভূত হয়েছিলেন মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যে এক বন্ধন রচনা করতে আর মানবজাতিকে একতাবদ্ধ করতে, আর তাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমার দোয়া এটাই যে, আমি দোয়া করি যেন অতিরিক্ত বিলম্ব হয়ে যাওয়ার পূর্বেই বিশ্ব তার সম্বিৎ ফিরে পায়। আমাদের সন্তানদের উপর আমাদের পাপের ভয়াবহ পরিণতির বোঝা চাপিয়ে না দিয়ে, আসুন আমরা তাদের জন্য আশা ও সম্ভাবনার এক উত্তরাধিকার রেখে যাই।

এ কথাগুলো সাথে, আমি দোয়া করি যেন খোদা তা'লা বিশ্ববাসীর বোধবুদ্ধি দান করেন এবং যে কাল মেঘ আমাদের উপর ছেয়ে আছে তা সরে গিয়ে এক উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দ্বার উন্মোচন করবে।মানবজাতির উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক। আমীন। সমবেত সকল অতিথিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

২এর পাতার পর...

প্রত্যেক যুগে মানুষকে প্ররোচিত করার জন্য নিত্যনতুন পথের সন্ধান করতে থাকে আর এই যুগে যখন কি না দাজ্জালী শক্তিগুলি শয়তানেরই প্রতিনিধি হিসেবে পূর্ণ শক্তি নিয়ে মানুষকে খোদা তা'লার পথ থেকে বিপথে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে, তারা বিভিন্ন পন্থায় মানুষকে, বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের মনে বিভিন্ন প্রকারের সংশয় তৈরী করে তাদেরকে ধর্মের বিষয়ে বিতশ্রদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করছে। তাই প্রত্যেক আহমদী নারী ও পুরুষের কর্তব্য, একদিকে যেমন এই সমাজে থেকে সমাজের অনৈকিতাসমূহ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা, অপরদিকে ইসলামি মূল্যবোধের সর্বোত্তম আদর্শ অন্যদের সামনে তুলে ধরার মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা এবং সমাজে ইসলামী শিক্ষার প্রচলন ঘটানোর পূর্ণ চেষ্টা করা। এই পরিবেশের সামাজিক কদাচারের অন্ধ অনুসরণ করে ইসলামী শিক্ষাকে ভুলে বসা উচিত নয়। অতএব, এখন আপনাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, আপনি খোদা তা'লার আদেশাবলী শিরোধার্য করে ধর্মের পথে পরিচালিত হয়ে, যা অবশ্যই কন্টকাকীর্ণ, নিজের ইহাকাল ও পরকালকে সুসজ্জিত করবেন না কি শয়তান এবং দাজ্জালী শক্তিগুলির লোভনীয় কথাবার্তা এবং তাদের বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ ও আকর্ষণীয় পথে চলে নিজেদের ইহকাল ও পরকালকে ধ্বংস করার উপকরণ তৈরী করবেন।

১ম পাতার পর.....

প্রকাশিত হলেও তা সে গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকবে। এই আয়াতে একথার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুফফারা মানুষের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তারের জন্য নিজেদের দস্তরখানাকে প্রশস্ত করত, সম্পদ উপার্জন করত এবং মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর উপর জয়লাভ করার জন্য গভীর পরিকল্পনা করত। অপরদিকে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এই সব বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, 'মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.)ই জয়যুক্ত হবেন আর কুফফারদের মনে তাঁর সফলতা দেখে ঈর্ষা তৈরী হবে।

এই আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 'লাও কানু মুসলেমুন' - কুফফাদের অস্থায়ী আবেগ এটি। নচেত তারা তো ভোগ বিলাস ও সম্পদ আরোহনে ব্যস্ত। আর অস্থায়ী আবেগ মানুষের কোন উপকারে আসে না, স্থায়ী আবেগই মানুষের উপকারে আসে। মুসলমানদের স্থায়ী আবেগ হল মুসলমান হওয়া, অস্থায়ীভাবে তারা খাদ্য গ্রহণ, সম্পদ আরোহণ এবং কিছু ভবিষ্যত পরিকল্পনাও করে থাকে। কাজেই এই সব কাজগুলি করেও তারা (মুসলমানেরা) হিদায়াত পাচ্ছে, কিন্তু কাফেররা হিদায়াত পায় না। (তফসীর কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir